দাম : ষোলো টাকা

দুর্নীতির দাঁড়িপাল্লায় সমান তালে
পাল্লা দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ও মুম্বাই
— পৃঃ ৩৫

স্বস্তিকা

গজবা-ই-হিন্দের ভাইরাস
দোভালের ভ্যাকসিন
— পৃঃ ১৩

৭৫ বর্ষ, ২ সংখ্যা।। ২৯ আগস্ট, ২০২২।। ১২ ভাদ্র - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

মোদী বিরোধীদের দুর্নীতিচক্র

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ২ সংখ্যা, ১২ ভাদ্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

২৯ আগস্ট - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

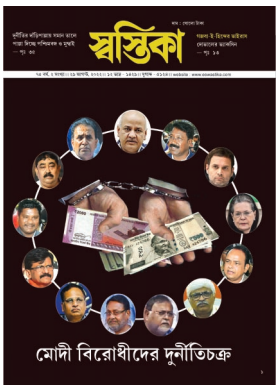

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

'ব্লিটজক্রিগ' বা ঝোড়ো আন্দোলনই মমতা বিরোধিতার একমাত্র রাস্তা ? □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

অনুপ্রেরণার পুজো □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

রাষ্ট্রের কণ্ঠহার বিনামূল্যে বিতরণ □ দীপঙ্কর গুপ্ত □ ৮

চীনের জন্যই অর্থনৈতিক স্থিতি বিনষ্ট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার □ বিশ্বামিত্র □ ১০

ইন্ডিয়ার দখলদারি থেকে মুক্ত হোক ভারত □ সন্দীপ চক্রবর্তী □ ১১

গজবা-ই-হিন্দের ভাইরাস দোভালের ভ্যাকসিন □ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ১৩

উত্তরপ্রদেশে ধর্ম যার যার বুলডোজার সবার □ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ □ ১৬

মণীশ সিসোদিয়ার পাঁচশো কোটি আবগারি কেলেংকারি □ সুমন চন্দ্র দাস □ ২৩

দুর্নীতিতে বামেরাও ধোয়া তুলসীপাতা নয় □ ভবানীশঙ্কর বাগচী □ ২৬

লোকগীতি দেশ ও জাতির পরিচিতি ঘটায় □ শেখর সেনগুপ্ত □ ৩১

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনার সহযোগীরা □ দীপক খাঁ □ ৩৩

দুর্নীতির দাঁড়িপাল্লায় সমান তালে পাল্লা দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ও মুম্বাই □ অসীম কুমার মিত্র □ ৩৫

মা কালী বিতর্কে হিন্দু বাঙ্গালির ভাবনা □ কল্যাণ চৌবে □ ৩৭

পশ্চিমবঙ্গে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছেন মমতা □ হীরক কর □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৮-৩০ □ খেলার জগৎ : ৩৮-৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
৫ সেপ্টেম্বর
২০২২

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৫ সেপ্টেম্বর
২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বঙ্গে শিক্ষার হাল

টেট পাশ করেননি এমন অনেককে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এইসব শিক্ষক কেউ এইট পাশ, কেউ আবার তাও নয়। অন্যদিকে সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য ডি-এ না দিয়ে বিভিন্ন ক্লাবকে ২৫৮ কোটি টাকার খয়রাতিতে বঞ্চিত হয়েছেন শিক্ষকেরাও। প্রশ্ন উঠতে পারে, পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকদের হাল যদি এরকম হয়, তাহলে শিক্ষার হাল ঠিক কেমন? শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে আগামী সংখ্যায় এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজবে স্বস্তিকা। লিখবেন— স্বপন দাস, ভবানীশঙ্কর বাগচী প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

With Best Compliments from :-

A

Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মোদী বিরোধীদের দুর্নীতি

দুর্নীতি শব্দটি ভারতের বিরোধী রাজনীতির পরিচয়ের মাপকাঠি হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় হইতে শুরু করিয়া দিল্লির উপ মুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া কিংবা একদা কট্টর শিবসৈনিক সঞ্জয় রাউত—কেহই পিছাইয়া পড়িতে রাজি নহে। এই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ঘনিষ্ঠ সহচর অনুব্রত মণ্ডল, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সহযোগী সত্যেন্দ্র জৈন ও আমানাতুল্লা খানের নাম যুক্ত হইয়াছে। আরও কত নাম তালিকায় স্থান লাভ করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

প্রশ্ন উঠিতে পারে ভারতের বিরোধী রাজনীতিতে কেন সহসা এই প্রকার পঙ্গুত্ব নামিয়া আসিল? কেন দলমতনির্বিশেষে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ লুট করিবার অভিপ্রায়ে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন? প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজনীতি ছিল রাজার নীতি। কেহ কেহ ইহাকে নীতির রাজা হিসাবেও ব্যাখ্যা করিতেন। মানবসেবার ক্ষেত্র হিসাবে পরিগণিত হইত রাজনীতি। রাজচক্রবর্তী সম্রাটগণ সন্তানের ন্যায় প্রজাবর্গকে রক্ষা করিতেন। কুম্ভমেলায় সর্বস্ব দান করিয়া সম্রাট হর্ষবর্ধন নিঃস্ব হইয়া যাইতেন। মধ্যযুগে মধ্য এশিয়া হইতে বর্বর পাঠান, মোঙ্গল ও মুঘলেরা ভারত আক্রমণ করিল। ভারতের রক্ষকেরাই হইয়া উঠিলেন ভক্ষক। রাজনীতির পরিসরে সেবার স্থলাভিষিক্ত হইল শোষণ। জিজিয়া করসহ নানাবিধ অন্যায় কর চাপাইয়া দিয়া হিন্দুদের শোষণ করিতে লাগিল ইসলামি শাসকেরা। মুসলমান শাসকদিগের কাল অন্তর্হিত হইলে ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিল ইংরাজরা। কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষের ভবিতব্য বদলাইল না। দুই শত বৎসরের শাসনকালে ব্রিটিশ রাজশক্তি যে পরিমাণ সম্পদ ভারতবর্ষ হইতে লুট করিয়া ইংল্যান্ডে লইয়া গিয়াছে তাহার অর্থমূল্য ৪৩ ট্রিলিয়ান ডলারের বেশি। কেবলমাত্র তাহাই নহে, ভারতের কৃষি, কুটির শিল্প-সহ সামগ্রিক অর্থ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে ইংরাজরা। যে ভারত একদা 'সোনে কি চিড়িয়া' নামে সারা বিশ্বে বিখ্যাত ছিল, স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে সেই ভারতই বিশ্বের দরিদ্রতম রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল।

দেশভাগের মর্মন্তুদ কলঙ্ক গাত্রে মাখিয়া স্বাধীনতা আসিল ১৯৪৭ সালে। কিন্তু তিমিরাবরণ ভেদ করিয়া সূর্যোদয় হইল না। জওহরলাল নেহরু তখন প্রধানমন্ত্রী, জিপ দুর্নীতিতে কলঙ্কিত হইল সরকার। সেনাবাহিনীর জন্য জিপ ক্রয় করিবার বরাতে দুই লক্ষ টাকার বেনিয়ম ধরা পড়িল। তারপর রাজীব গান্ধীর আমলে বোফর্স এবং ড. মনমোহন সিংহের দশ বৎসরের শাসনকালে আটটি বৃহৎ আর্থিক দুর্নীতি দেশের মানুষ দেখিয়াছেন। সুতরাং আজ যাহা হইতেছে তাহা কেবলমাত্র আজিকার ঘটনা নহে, ইহার শিকড় সুদূর অতীতের কোণায় কোণায় বিস্তৃত। বিশেষ করিয়া যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ও নেতৃবর্গ কংগ্রেসের সংস্কৃতিতে লালিত-পালিত হইয়াছেন তাদের নিকট দেশের মানুষ ভোটার মাত্র এবং মাতৃভূমি দোহন করিবার যন্ত্রবিশেষ। অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীশ সিসোদিয়া, অখিলেশ যাদব, মায়াবতী, তেজস্বী যাদব—কেহই ইহার ব্যতিক্রম নহেন। ব্যতিক্রম নহেন সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীও। তাহারা ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় অভিযুক্ত। দেশ যখন স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালন করিতেছে তখন তাহাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অর্থ আত্মসাৎ করিবার অভিযোগ উঠিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান দেশকে জানিবার ও বুঝিবার কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গীটি কী প্রকারের! ভাগ্য ভালো দেশের রাজনৈতিক চিত্র সর্বার্থে একইরকম নেতিবাচক নহে। যাহারা উত্তম সংস্কার পাইয়া রাজনীতিতে আসিয়াছেন তাহারা সেবার আদর্শ হইতে এখনও বিচ্যুত হন নাই। তাহাদের রাজনীতিতেও এই আদর্শ দুর্লভ নহে। দেশের জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন রাজনৈতিক শক্তি বিজেপির নেতৃবর্গের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করিলেই তাহা বোঝা যাইবে। বিজেপি নেতা বঙ্গারু লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠিয়াছিল কিন্তু দল তাহার পার্শ্বে দাঁড়ায় নাই। লালকৃষ্ণ আদবানীও আদালতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করিবার পর সরকারে ফিরিতে পারিয়াছিলেন।

এক্ষণে যাহারা বিরোধী রাজনীতির কাণ্ডারি তাহারা সকলেই নরেন্দ্র মোদীর বিরোধী। বস্তুত মোদী বিরোধীতা ভিন্ন তাহাদের রাজনীতিতে আর কিছুই নাই। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর সংস্কার তাহাদের কোথায়? যতদিন না তাহারা সংস্কার প্রাপ্ত হইবেন ততদিন তাহাদের ঝুলি হইতে এই প্রকার মাঝে মাঝে বিড়াল বাহির হইয়া পড়িবে। কেহই কিছু করিতে পারিবে না।

সুভাষিতম্

রাষ্ট্রস্য সুদৃঢ়া শক্তিঃ সমাজস্য চ ধারিণী।

ভারতে সংস্কৃতে নারী মাতা নারায়ণী সদা।।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারী সদাসর্বদা মাতা নারায়ণী স্বরূপা। কেননা তাঁরা রাষ্ট্রের সুদৃঢ় শক্তিস্বরূপিনী এবং সমাজ ধারণকারিণী।

‘ব্লিটজক্রিগ’ বা ঝোড়ো আন্দোলনই মমতা বিরোধিতার একমাত্র রাস্তা ?

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

‘‘রাজ্যজুড়ে যে অরাজকতা আর দুর্নীতি চলছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী নেত্রী থাকলে সারা রাজ্যে আগুন জ্বলতো।’’ হেসে হেসেই বললেন তৃণমূল নেতা। ভাবটা এমন, তৃণমূলের নেতারা চোর বাটপার সন্দেহে ধরা পড়লেও বিরোধীরা তার ফয়দা তুলতে পারবে না। রাজ্যে মমতা বিরোধী ভোট ৪৭ শতাংশ! শাসক তৃণমূলের থেকে ১ শতাংশ কম। মমতা বিরোধী আন্দোলনে তার কোনও প্রতিফল নেই।

অনেকদিন আগেই বিরোধী হিসেবে বামপন্থীরা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অনেকের ধারণা শাসক তৃণমূলের পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে শেষ আশা বিজেপি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়ে গিয়েছেন, ‘মমতার তৈরি সিপিএম-উচ্ছেদ মডেলেই মমতাকে উচ্ছেদ করতে হবে।’ মমতাকে নিয়ে ঠাট্টা করে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন, ‘উনি তো জঙ্গি আন্দোলন করেন। আমাদের সঙ্গে আসলেই পারেন।’

বলতে বাধা নেই মমতাবিরোধী তীব্র লড়াইয়ে কোথায় একটা রাজনৈতিক আর সামাজিক ফাঁক থেকে গিয়েছে। রাজ্যের এক নেতা দিল্লিতে অনেকবার দরবার করে তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সংস্থাদের সক্রিয় করতে সফল হন।

কিন্তু ইস্কুল রুটিনের মতো ‘মাপজোপের’ আন্দোলনে মমতাকে সরানো কঠিন বা দিবাস্বপ্ন বলেই আমার ধারণা। দুর্নীতির পাহাড়ে বসে রয়েছে শাসক তৃণমূল দল আর মমতার বশংবদরা। মমতার বাম বিরোধী আন্দোলন ছিল মিথ্যা নাটক আর সত্যের মিশ্রণ। নিজের দল তৈরির ১৩ বছরের মধ্যেই বামেদের উচ্ছেদ করে মমতা। বামেরা এখন কেবল পতাকাবাহী দল। বিধানসভায় তারা শূন্য। সংসদে নগণ্য। রাজ্যে ভোট ৪ শতাংশ। কেন্দ্রে ২ শতাংশ।

> রাজ্যে প্রকৃত বিরোধী দল ইডি আর সিবিআই। সর্বাঙ্গীণ দুর্নীতির যে বাতাবরণ রাজ্যে তৈরি হয়েছে তা ভাঙতে গেলে বিজেপি-কে বহু অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে।

আশির দশকের বিজেপি আর এখনকার বিজেপি এক নয়। ২০২১ রাজ্য নির্বাচনে ২ কোটি ২৮ লক্ষ মানুষের ভোট পায় বিজেপি। এক বছরের মধ্যে সে মর্যাদাকে সম্মান জানিয়ে কেন বিজেপি নেতারা মমতা বিরোধী যুৎসই আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলেন না এটা ভেবে দেখতে হবে।

মমতাকে সামলাতে বামেরা হিমসিম খেত। আমার ধারণা মমতাকে হিসসিম খাওয়াতে পারে এমন নেতা বিজেপি-কে তৈরি করতেই হবে। নয়তো তারা অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। তৃণমূলের পরামর্শদাতা আই-প্যাক জানিয়েছিল বিজেপি রাজ্যে থাকতে এসেছে, চলে যেতে নয়।

এখন পশ্চিমবঙ্গের অন্য নাম দুর্নীতি রাজ্য। দুর্নীতির অভিযোগে তৃণমূলের কেষ্ট, বিষ্টু নেতা মন্ত্রীরা গ্রেফতার হচ্ছেন। তাতে ‘ভ্যালু অ্যাড’ বা ‘রাজনৈতিক মূল্য’ যুক্ত করাই মূল কথা।

মাপজোপের রাজনীতি ছেড়ে তাই ব্লিটজক্রিগই একমাত্র রাস্তা। অনেকেই বলছেন, রাজ্যে প্রকৃত বিরোধী দল ইডি আর সিবিআই। সর্বাঙ্গীণ দুর্নীতির যে বাতাবরণ রাজ্যে তৈরি হয়েছে তা ভাঙতে গেলে বিজেপি-কে বহু অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। সামনে দুর্গাপুজো। মহাভারতকার বলেছেন, পাপের ঘর সদাই বড়ো। সে ঘর ধ্বংস করতে কৌশল আর আদর্শ দুই প্রয়োজন। নয়তো সে আন্দোলন বা লড়াই হবে বন্ধ্যা। □

With Best Compliments from -

A

Well wisher

অনুপ্রেরণার পুজো

কৈলাস থেকে স্বয়ং মহাদেব গ্রিটিংস কার্ড পাঠাবেন। আসলে স্বামী হিসেবে এতো তাঁর দায়িত্ব। গিন্নি উমা আসবেন মর্ত্যে। দেশের সর্বত্র তো বটেই অন্য দেশেও পুজো পাবেন দুর্গা। কিন্তু আর কোথায় এমন টাকার ডালি দিয়ে আগমনী গাওয়া হয়! কোথাও না। সেই কারণেই কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আপনাকে চিঠি লেখাই উচিত মহাদেবের।

আর রাজ্যের প্রতিটি পুজো কমিটিতে লেখা উচিত 'মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় দুর্গোৎসব'। আপনার ছবিও রাখা উচিত। ভাইপোর ছবি নয়, শুধু আপনার। সেই ছবিতে কেষ্ট, পার্থর ছায়া থাকবে না। নীচে থাকবে কাশফুল, উপরে সাদা মেঘের ভেলা। ছবিতে ধূপের গন্ধও মেশানো থাকতে পারে।

রাজ্যের হাতে টাকা নেই বলে 'কান্নাকাটি' করা হলেও 'খয়রাতি' করতে অর্থের অভাব নেই! আপনি পুজো কমিটিগুলির জন্য অনুদান বাড়ানোর ঘোষণার পর থেকেই বিরোধীরা এক সুরে সরব। এ বার আরও এক ধাপ এগিয়ে কেউ কেউ দাবি করছে, এই টাকায় রাজ্যের অনেক উন্নয়ন সম্ভব ছিল। শুধু তা বলাই নয়, ফেসবুকে তার হিসাবও দিচ্ছে কেউ কেউ। আমি ওদের পাত্তা দিই না। এটা তো আপনার জানাই। বরং আমি অনুগত ভাই হিসেবে মনে করি দুর্গাপুজোর সঙ্গে রাজ্যের অর্থনীতিও যুক্ত। বেকার তৃণমূল কর্মীদের হাতে হাতে অর্থ পৌঁছে দিতে বছরে একবার রাজ্য সরকার এই উদ্যোগ নেয়।

তবে একটা হিসেবও কষেছি। হিসেব করে দেখেছি, এই টাকায় কী কী হতে পারত। আপনি যে হিসেব দিয়েছেন তাতে মোট ৩৪ হাজার পুজো কমিটিকে ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। তাতে সরকারের মোট খরচ হবে ২৫৮ কোটি টাকা। এর পরেও সরকারি খরচে ১ সেপ্টেম্বরে কলকাতা ও জেলায় জেলায় শোভাযাত্রা, রাজ্য জুড়ে পুজোর কার্নিভালেও কোটি কোটি টাকা খরচ হবে। কিন্তু যদি ওই ২৫৮ কোটির হিসাব কষা যায় তাতেও অনেক কিছু সম্ভব। বাঙ্গলায় প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু মিড ডে মিল বাবদ বাজেট ৪.৯৭ টাকা।

> যে প্রবল জনরোষ তৈরি হয়েছে রাজ্য সরকার নিয়ে তা থেকে তৃণমূল সরকারকে রক্ষা করবে টাকা পাওয়া দুর্গাপুজো কমিটিগুলোই। ক্লাবগুলিকে কিনে নিতে পারলে 'চোর চোর' আওয়াজ বন্ধ করে 'পুজো পুজো' আওয়াজ উঠে যাবে।

তার মানে এই টাকায় প্রায় ৫২ কোটি মিড ডে মিল হতো। উচ্চ প্রাথমিক (৭.৪৫ টাকা প্রতি পড়ুয়া) ৩৪ কোটি ৬৩ লক্ষের বেশি মিড ডে মিল বাবদ খরচ করা যেত। রাজ্যের হাসপাতালে ভর্তি হয়ে রোগীদের মেঝেতে শুতে হয়। প্রতিটি বেডের জন্য ৫০ হাজার টাকা খরচ ধরলে রাজ্যে ৫১ হাজার ৬০০ শয্যা হাসপাতালে বাড়ানো যেত। এক একটি নলকূপ তৈরিতে ৭০ হাজার টাকা খরচ ধরলে রাজ্যে পানীয় জলের সমস্যা অনেকটা মিটত। গ্রামাঞ্চলে ৩৬ হাজার ৮৬০টির মতো নলকূপ বসানো সম্ভব ছিল।

আর শিক্ষাক্ষেত্রেও এই টাকা বিনিয়োগ করা যেত। রাজ্যের ২৫৮টি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলকে এক কোটি টাকা করে উচ্চ মানের ল্যাবরেটরি বানানোর জন্য দেওয়া যেত। মাত্র ১০ লক্ষ টাকা করে দিলে ২,৫৮০টি প্রাথমিক স্কুলের উন্নয়ন সম্ভব ছিল।

যে হোকগে। হিসেব কষেছি কিন্তু সেটা নিয়ে ধরে বসে থাকতে পারছি না। বরং, আমি মনে করি সরকারি কর্মীদের প্রাপ্য ডিএ দেওয়ার চেয়ে এটা বেশি ভালো। হাসপাতালে ওষুধ কেনার চেয়ে পুজোয় খরচ বেশি জরুরি।

তবে দিদিভাই কেউ কেউ যা বলছে তা কিন্তু মারাত্মক। আমারও সেটা সত্যি বলেই মনে হচ্ছে। অনুদান পেয়ে কোনও লোক উদ্বাহু নৃত্য করলে তাঁদের বাড়ির লোকেরাই তাড়া করতে পার। বলতে পারে, রাজ্যে কাজ নেই, কিছু নেই আর মোচ্ছব করার টাকা? না, দিদি কান দেবেন না। যে প্রবল জনরোষ তৈরি হয়েছে রাজ্য সরকার নিয়ে তা থেকে তৃণমূল সরকারকে রক্ষা করবে টাকা পাওয়া দুর্গাপুজো কমিটিগুলোই। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি তথা দুর্নীতির অভিযোগে বিভিন্ন তদন্ত থেকে চোখ সরানোর কাজও করবে। ক্লাবগুলিকে কিনে নিতে পারলে 'চোর চোর' আওয়াজ বন্ধ করে 'পুজো পুজো' আওয়াজ উঠে যাবে। বাঙ্গলার যে সংস্কৃতি তাতে দুর্গাপুজো মানে বারোয়ারি বারো ইয়ারের পুজো। সর্বজনীন। সকলের উদ্যোগ। চাঁদা তুলে তন-মন-ধন দিয়ে পুজো করা। সেই পুজোকে তৃণমূল 'সরকার পোষিত' পুজো করে দিতে পেরেছে। এই কৃতিত্বকে ছোটো করে দেখা যাবে না। □

অতিথি কলম

দীপঙ্কর গুপ্ত

রাষ্ট্রের কণ্ঠহার বিনামূল্যে বিতরণ

আজ থেকে দীর্ঘকাল আগে পাশ্চাত্য দেশগুলি ভরতুকি না দিয়ে স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নতিতে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছিল। আজ ভারতেরও সেই নীতি গ্রহণ করার সময় এসেছে। মুফতে বিলিয়ে দেওয়ার নীতি (যা কোনো নীতিই নয়) আজ ভারতে এমন একটা উচ্চতায় পৌঁছেছে যে মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতকেও মাঝে মধ্যে তার বিরুদ্ধে নিজেদের ন্যায়দণ্ডটি ঠুকতে হচ্ছে। বিচারকেরাও এর ভবিষ্যত সম্পর্কে সরকারকে সাবধান করার চেষ্টা করছেন। প্রশ্ন হলো, বিনামূল্যে বিতরণ বা freebies যাকে বলা হচ্ছে সেটি আসলে কী? একইসঙ্গে এই প্রশ্নটাও উঠছে কেন freebies অর্থনৈতিক ভাবে গরিব দেশগুলিতেই এত দাপট দেখায়?

নজর করলে দেখা যায় ভারত যদিও জিডিপি হারের ক্ষেত্রে আমেরিকা বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের তুলনায় পিছিয়ে আছে তবে ভরতুকি প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা এগিয়ে রয়েছি। পাশ্চাত্যের কোনো উন্নত অর্থনীতিই মোট জিডিপি-র ১ শতাংশ ভরতুকিও অর্থনীতির কোনো ক্ষেত্রে বরাদ্দ করে না। উদাহরণ হিসেবে জার্মানির ভরতুকির পরিমাণ মোট জিডিপি'র ০.৯ শতাংশ। সেই তুলনায় শুধু কৃষিক্ষেত্রেই ভারতের ভরতুকির পরিমাণ জিডিপির ২.২৫ শতাংশ। শক্তি বা বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে নানা ডামাডোল বিরাজমান থাকায় জিডিপির ৪ শতাংশ তারাই হজম করে (এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সংবাহন কেন্দ্রগুলিকে রাজ্যগুলি ব্যাপক বকেয়া রাখে)। উন্নত অর্থনীতির পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় আমেরিকায় ভরতুকির পরিমাণ আরও নগণ্য। যেখানে বাৎসরিক মোট ভরতুকি ২০ বিলিয়ন ডলার আর ইংল্যান্ডে তা ৬ বিলিয়ন ডলার। এই পরিমাণকে নগণ্য ভরতুকি বলার কারণ দেশগুলির জিডিপির পরিমাণ অনেক বেশি। মার্কিন জিডিপির মোট অর্থমূল্য ২১ ট্রিলিয়ন আর ইংল্যান্ডের ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার।

বিনামূল্যে বিতরণ দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার একটা বড়ো কারণ। এটা এমনই এক মধুভাণ্ড যার প্রয়োজন নেই নিজের সামর্থ আছে সেও সরকারের বোঝা বাড়িয়ে নির্দ্বিধায় এই সুযোগ নেয়। এই ঘটনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উন্নতিশীল (developing) দেশগুলির ক্ষেত্রেই নজরে পড়ে যেখানে সমাজ আবার বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। ঋণ মকুব করা, ভরতুকি সমেত বা বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ ক্ষেত্রগুলিই মূলত বেছে নেওয়া হয়। এর কারণ এই স্তরে বসবাসকারী মানুষরা সাধারণত গরিব। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে দেখা যায় আদতে এটি সকলকে বিনামূল্যে বিতরণ করার চেহারা নিয়েছে। এর কারণ যে স্তরের লোকেদের ভরতুকির জিনিসপত্র কেনার দরকার নেই নিজের যথেষ্ট সামর্থ্য আছে তারাও সুযোগ বুঝে সুবিধে ভোগ করে ভরতুকির জিনিসপত্রগুলিকে দান দেওয়ায় (freebies) পরিণত করে। বহুক্ষেত্রে ভরতুকির মাল পুর্নবিক্রিত হয়ে যায়। সেই কারণে এটা নিশ্চিত করা জরুরি যে কোনো বস্তু বিনামূল্যে বিতরিত হচ্ছে। এবং সঠিক মানুষজনের যাদের সত্যিই প্রয়োজন তাদের কাছেই কেবল যাচ্ছে কিনা।

বাস্তবে ব্যাংকের ঋণ মকুব, ভরতুকি সম্বলিত কৃষি সার, কম মূল্যে বিদ্যুৎ বা খাদ্যশস্য সবই বড়ো লোকেরাই অর্থাৎ অযোগ্যরাও যখন অকাতরে ভোগ করে তখন যে প্রকল্প 'দরিদ্র কল্যাণ' প্রকল্প বলে শুরু হয়েছিল তা অতি সহজেই জনসাধারণের চোখে মুফতের মাল বা

সর্বদা বিভিন্ন ভাষণ বা লেখালিখিতে শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের গালভরা কথা বলা হয় কিন্তু সে কাজে সফল হতে গেলে ভরতুকি তুলে নেওয়ার কঠিন সিদ্ধান্ত এখনই নিতে হবে। তবেই কার্যকরভাবে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হতে পারে।

বিনামূল্যে বিতরণ সামগ্রী বলেই চিহ্নিত হয়। এই সূত্রে যখন ভারতে প্রদেয় সামগ্রিক ভরতুকির পরিমাণ ডলারে হিসাব করা যায় তখন তা মার্কিন ভরতুকির তিনগুণ বা জার্মানির ভরতুকির ১৫ গুণ হয়ে দাঁড়ায়। এরই পরিস্থিতিতে ভরতুকিকে হটিয়ে দিয়ে একেবারে বিনামূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্য প্রণোদিত নীতি জায়গা করে নেয়।

একটু গভীরে ঢুকে দেখলে আরও চমক খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ, কঙ্গো, অ্যাঙ্গোলা বা ক্যামেরুনের মতো ছোটো দেশগুলি ইটালি, কানাডা বা ইংল্যান্ডের চেয়ে ডলারের হিসেবে বেশি ভরতুকি দিয়ে থাকে। এর থেকে খুব সহজেই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে এই ভরতুকির বন্যা লাগিয়ে দেওয়ার পর তাদের হাতে সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়ন বা শিক্ষাখাতে বরাদ্দের জন্য আর প্রায় কিছুই থাকে না। যেমন থেকে যায় অস্ট্রেলিয়া, কানাডা বা স্পেন প্রভৃতি দেশের হাতে যারা আফ্রিকার দেশগুলির তুলনায় ভরতুকি খাতে ন্যূনতম খরচা করে।

অবশ্যই এশিয়া বা আফ্রিকার দেশগুলিকে কেন ভরতুকি খাতে এত বিপুল খরচা করতে হয় তার যথেষ্ট ন্যায্য কারণ আছে যে কারণে তারা স্বাস্থ্য, শিক্ষাখাতে পরিকাঠামো উন্নয়নে অধিক ব্যয় করতে পারে না। বাস্তবে ভারতে এত বেশি মানুষ কৃষিক্ষেত্রের ওপর নির্ভরশীল যে সেখান থেকে ভরতুকি তুলে নিলে গ্রামীণ দরিদ্রের সংখ্যা আরও বাড়বে। ফলে এই ভরতুকি দেওয়া হয় এবং সহচর বিপদগুলিও সঙ্গী হয়। আর এই ভরতুকি দিয়ে ঠেকনা দেওয়ার বিষয়টা রাজনীতিগত ভাবে খুবই আকর্ষণীয় কেননা এটা চটজলদি একটা নিরাময়ের সাময়িক ব্যবস্থা করে। আর এই সহজ রাজনীতির অভ্যাস একবার রপ্ত করে নিতে পারলে তাকে ছাড়া খুবই কঠিন যেহেতু হাতে গরম ফল পাওয়া যায়।

আমাদের সামগ্রিক শ্রমশক্তির ৪০ শতাংশ কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত আছে। সেখান থেকে যে আয় হয় তা মোট জিডিপির ১৭ শতাংশ। কিন্তু এই কৃষি থেকে মানুষের আয় কিন্তু কম। এরই ফলে গ্রাম থেকে প্রতিনিয়ত তরতাজা যুবকদের সব চেয়ে আগে পাওয়া ট্রেন বা বাসে চড়ে শহরে পালিয়ে যেতে দেখা যায়। এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে ভরতুকি জট আরও বৃদ্ধি পেতে সুবিধে হয়। আর ভরতুকি ভোগ জারি থাকলে একেবারে বিনিপয়সার ভোজ কি পিছিয়ে থাকবে অর্থাৎ freebies?

এবার আমাদের কৃষিক্ষেত্রের পরিসংখ্যানগুলিকে বিশ্বের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যাক। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অধীন দেশগুলিতে কৃষি সামগ্রিক জিডিপির মাত্র ১.৩ শতাংশ ভাগ। আর আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে এই পরিমাণ জিডিপির ০.৫ শতাংশ। অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতেও হার প্রায় একই রকম। সামগ্রিক পর্যালোচনায় তাহলে এটিই উঠে আসছে যে ভারতের জনসংখ্যার বিরাট অংশ কৃষির সঙ্গে যুক্ত ও নির্ভরশীল হওয়ায় এবং কৃষিতে আয় কম হওয়ায় তারা গরিব। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ অতি দ্রুত সাময়িক সাহায্যের ব্যবস্থা করে। এখানে অপেক্ষার কোনো স্থান নেই। সার্বজনীন স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মানোন্নয়ন কোনো রাতারাতি সমাধা হওয়ার মতো প্রক্রিয়া নয়। এগুলি কাজে আসতে, পূর্ণ মাত্রায় সফল হতে ১০ থেকে ১৫ বছরের একটা অপেক্ষার সময় থাকে। তারপরই তারা দেশের জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। গরিব দেশগুলিতে এই অপেক্ষার কাল আদৌ খাপ খায় না এর ফলেই তড়িঘড়ি ঋণ মকুবের নিদান দিতে হয়। দিতে হয় বিনা মূল্যে জল, বিদ্যুৎ, সস্তা সার প্রভৃতি। সর্বদা বিভিন্ন ভাষণ বা লেখালিখিতে শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের গালভরা কথা বলা হয় কিন্তু সে কাজে সফল হতে গেলে ভরতুকি তুলে নেওয়ার কঠিন সিদ্ধান্ত এখনই নিতে হবে। তবেই কার্যকরভাবে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হতে পারে। কিন্তু এ অতি কঠিন ব্যাপার। কেননা অনন্তকাল থেকে ভরতুকি ভোগ করতে করতে আমরা এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে হয়তো ভুলেই গেছি যে আমরা ভরতুকি নিয়ে থাকি।

অন্যদিকে এটা মনে হতে পারে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি অত্যন্ত জরুরি ক্ষেত্রে উন্নতির আবশ্যিক শর্তই হচ্ছে ধনবান অবস্থায় থাকা। এটি আদৌ সত্য নয়। অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশ যাদের আমরা উল্লেখিত জরুরি ক্ষেত্রগুলিতে অত্যন্ত উন্নত বলে চাক্ষুষ করছি তারা কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রগুলিতে যখন বিনিয়োগ করেছিল, আদৌ ধনবান ছিল না। উলটে তারা গরিব দেশের পর্যায়ভুক্তই ছিল। কিন্তু একটা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাদের দৃঢ় হাতে নিতে হয়েছিল তা হলো ভরতুকি প্রদান বন্ধ করা। এবং এই বন্ধের ব্যবস্থা তারা করেছিল এমন একটা সময় যখন নিজের অজান্তেই ভরতুকি সুবিধেজনক ভাবে বিনামূল্যে বিতরিত (freebies) নামে রূপান্তরিত হতে পারেনি। আর এই হাতে থাকা টাকা তারা বিনিয়োগ করেছিল দীর্ঘস্থায়ী সার্বজনীন কল্যাণকর উন্নয়নের খাতে। যে কারণে ইউরোপে অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি ও সামান্য সামর্থ্যের ব্যক্তিও আজ একই সঙ্গে একই রকম পরিষেবা পাওয়ার যোগ্য এবং পেয়ে থাকেও। সে সময় যখন এই উন্নয়নমূলক কাজের ইউরোপে সূত্রপাত হয়েছিল তখন পণ্ডিত সংস্কারকরা বলেছিলেন এটি অন্ধকারে লাফ দেওয়ার মতো কাজ। কিন্তু এই ঝুঁকি না নিলে বিনে পয়সায় ভোগ করা আজ প্রকৃতির দান বলে গণ্য হতো।

(লেখক বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী)

With Best Compliments from -

A Well wisher

চীনের জন্যই অর্থনৈতিক স্থিতি বিনষ্ট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার

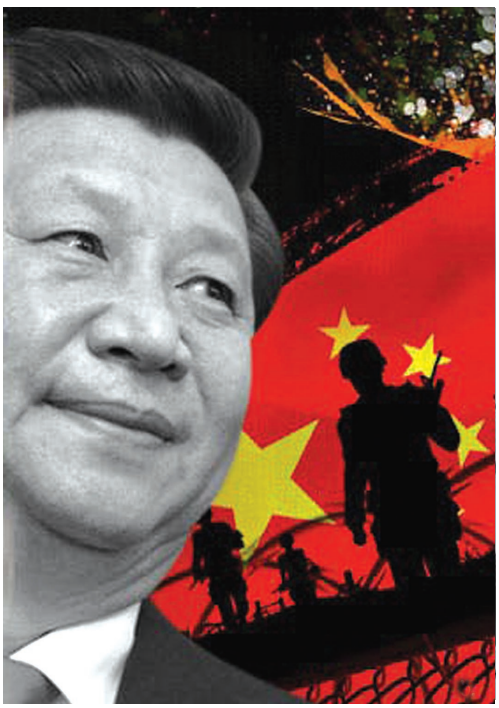

কয়েক বছর আগে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল চীন। সেইসঙ্গে সামরিক ও কূটনৈতিক শক্তিতে পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রাজত্ব করার আশাও করেছিল তারা। আর এর জন্য বেছে নিয়েছিল অন্যায্য পন্থা। তাই কোভিড-উত্তর পরিস্থিতিতে চীনের অর্থনীতি যেমন ডুবতে বসেছে, শুধু তাই নয়, এর ফলে পুরো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতিই টলায়মান, সুতরাং এই অঞ্চলে আগামীদিনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

চীনের এই অর্থনৈতিক অসততার মূলে তাদের বিআরআই প্রকল্প। যে প্রকল্পের অন্তর্গত রেলওয়ে, বন্দর, পথঘাট, বিদ্যুৎ, জলাধার নির্মাণ পরিকাঠামো নির্মাণ করতে চীনা সরকার বিভিন্ন দেশে বিপুল পরিমাণ ঋণ দিয়ে থাকে। বিশ্বের প্রায় সত্তরটি দেশ চীনের কাছ থেকে এই প্রকল্পে ঋণ নিয়েছে বলে সূত্রের খবর। চীন এই প্রকল্পে ঋণ দান করে সুদ সমেত বিপুল টাকা মুনাফা করে। এই ফাঁদে পা দিয়েই শ্রীলঙ্কা সর্বস্বান্ত হয়েছে। অনুরূপ অবস্থা পাকিস্তানেরও। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজির অর্থনীতির অধ্যাপক ড. রসুলকে উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, উন্নয়নশীল দেশগুলির বিদেশি ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত। নাহলে শ্রীলঙ্কার মতো পরিণতি হবে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন।

চীনের পরবর্তী লক্ষ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ও লাওস। এই দুই দেশেরই চীনের কাছে প্রভূত মাত্রায় ঋণ রয়েছে বলে জানা গেছে। বাংলাদেশ অবশ্য চীনের এই ফাঁদ কেটে বেরোতে মরিয়া। বি আর আই প্রকল্পে বাংলাদেশের চীনের কাছে ঋণের পরিমাণ প্রায় চারশো কোটি মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশের মোট বিদেশি মুদ্রার ছয় শতাংশ। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী এএইচএম মুস্তাফা সেদেশের আর্থিক সংকটের জন্য চীনকেই দায়ী করেছেন। এবং চীনের পাতা এই ফাঁদ থেকে যে বাংলাদেশ মুক্তি চাইছে তা বোঝা গিয়েছে যখন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা আইএমএফের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য চেয়েছে তারা, চীনের দিকে আর ঝোঁকেনি।

কিন্তু অসৎ পথে চলতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছে চীনের অর্থনীতিও। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি ও জ্বালানি সংকট বিশ্বজুড়েই অর্থনীতিতে বড়ো ধরনের প্রভাব ফেলেছে। তার উপরে চীনের সমরাঙ্গনে আগ্রাসী মনোভাব, তাইওয়ানের সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতি ও আমেরিকার তাতে জড়িয়ে পড়া চীনের অর্থনীতিতে বড়ো ধরনের প্রভাব ফেলেছে। এমনিতে বিশ্বের দুই বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি আমেরিকা ও ভারতেও লাফিয়ে বাড়ছে মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রাস্ফীতির হার ৭ শতাংশের নীচে নামছেই না। চীনের ব্যাংক ও নির্মাণশিল্পে সবচেয়ে বড়ো অর্থনৈতিক ধ্বস নেমেছে। অন্যান্য কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে করোনাও। চীন যে করোনাকে 'বায়োলজিক্যাল ওয়েপেন' হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়েছিল, তা এতদিনে প্রমাণিত। এখন ব্যুমেরাং হয়ে তাদের দিকেই ফিরে আসছে। ফলে 'জিরো করোনা' নীতি নিতে বাধ্য হয়েছে চীন। আর এর প্রভাব চূড়ান্তভাবে সেদেশের ব্যাংক ও নির্মাণ শিল্পের উপর পড়েছে। সামগ্রিকভাবে তাই সেদেশের অর্থনীতিতে ধ্বস নেমেছে। এখন প্রশ্ন, ভারতে এর কী প্রভাব পড়বে? নরেন্দ্র মোদী সরকার এই কঠিন পরিস্থিতিতে যা ব্যবস্থা নিয়েছে, তাতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চিন্তা নেই বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে চীনের বিআরআই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য ছিল কূটনৈতিক দিক দিয়ে ভারতকে চাপে রাখা। সেই চেষ্টা আপাতত ব্যুমেরাং হলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শান্তি বিঘ্নিত হলে ভারতের স্থিতিশীলতাও কিছুটা বিনষ্ট হবে। অর্থনীতি নিয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি কিন্তু সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। □

ইন্ডিয়ার দখলদারি থেকে মুক্ত হোক ভারত

ব্রিটিশ রাজশক্তি নিজের স্বার্থে ইন্ডিয়াকে বানিয়েছিল। স্বাধীন হবার পর ভারতের আর ইন্ডিয়াকে প্রয়োজন নেই। নিজেকে ভারতীয় বলার মধ্যে যে গর্ব আছে তা ইন্ডিয়ান বলার মধ্যে একেবারেই নেই। কারণ সেখানে আজও উপনিবেশের কলঙ্ক আছে।

সন্দীপ চক্রবর্তী

ভারতের মেধা-মানচিত্রে ইন্ডিয়া নামের একটা দেশ কে বানিয়েছিল? প্রশ্নটা যত গোলমেলে উত্তরটা তত নয়। ভারতকে ইন্ডিয়া বানিয়েছিল ব্রিটিশ। ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষাসচিব মেকলে এমন এক শিক্ষানীতি প্রবর্তন করেছিলেন যার সোজাসাপটা উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের জাতিগত পরিচয়ের পরিসরটি লুপ্ত করে দেওয়া। যাতে এ দেশের নাগরিকেরা জাতীয়তাবোধের 'দুরারোগ্য ব্যাধি'তে না আক্রান্ত হন। মেকলে চেয়েছিলেন ভারতীয়রা শুধুমাত্র জন্মসূত্রে ভারতীয় হয়ে থাকুন। চিন্তাভাবনায়, আচার-আচরণে এবং ভারতীয়ত্বের বিরোধিতায় হয়ে উঠুক আগমার্কা ব্রিটিশ। যে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের জোরে ভারত হাজার হাজার বছর ধরে তার অস্তিত্ব ও অস্মিতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তা ধ্বংস করে দিক ইংরেজিয়ানা। হ্যাঁ, এমনটাই চেয়েছিলেন মেকলে এবং ব্রিটিশ সরকার। বস্তুত ১৮৫৭ সালে সিপাহি মহাসংগ্রামের পর কোণঠাসা ব্রিটিশের এটা ছিল প্রত্যাঘাত। ইংল্যান্ডের নীতিনির্ধারকেরা ভারতের মানুষকে চিরকালের জন্য ক্রীতদাসে পরিণত করতে চেয়েছিলেন।

বলাবাহুল্য, ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হলেও এবং ব্রিটিশ এ দেশ ছেড়ে চলে গেলেও, আজও আমাদের মধ্যে অনেকে মেকলের পরিকল্পনাকে সার্থক করে চলেছি। আমাদের মধ্যে ক'জন বুকে হাত রেখে বলতে পারি যে আমরা নিখাদ ভারতীয়, মেকলিয়েটিজমের ইশারায় গা ভাসানো ইন্ডিয়ান নই? সারা দেশে এরকম বহু মানুষকে পাওয়া যাবে যারা বুঝে অথবা না বুঝে পশ্চিমী ন্যারেটিভে সায় দেন। এদের মধ্যে অনেক বুদ্ধিজীবীও আছেন যারা জানেন এইসব ন্যারেটিভের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো ভারতের জাতীয় সংহতিকে নষ্ট করা। তবুও তারা কখনও নগদের লোভে আবার কখনও-বা একটা ডি-লিটের লোভে দাসত্ব করেন। অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও আমরা এখনও মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারিনি। আমাদের মজ্জায় মজ্জায় রয়ে গেছে ঔপনিবেশিক মানসিকতা। এই মানসিকতা কতটা নেতিবাচক স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যে পাঁচটি সংকল্পের কথা তিনি বলেছেন তার একটি হলো মানসিক (এবং মেধাগত) দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার সংকল্প। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে নরেন্দ্র মোদী দেশের মানুষকে ইতিবাচক প্রবাহের দিকে এগিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। স্বাধীনতা দিবসের ভাষণেও তিনি সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন। আশা করা যায় দেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে সব ধরনের মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করবেন।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে এই মানসিক দাসত্ব একটি দেশের একশো পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষের অ্যাটিটিউডের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর হতে পারে যে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে তার জন্য মাথা ঘামাতে হয়? এ প্রশ্নের উত্তর সাম্প্রতিক একটি বিতর্ক থেকেই পাওয়া যেতে পারে। কিছুদিন আগে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে আমির খানের লাল সিংহ চাড্ডা নামের একটি সিনেমা। ছবিটি নিয়ে বিতর্ক চলছে মুক্তির কয়েক মাস আগে থেকেই। অভিযোগ, ছবিতে শিখ সম্প্রদায় ও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অপমান করা হয়েছে। অভিযোগ মিথ্যে নয়, যারা দেখেছেন তারা জানেন। ছবি রিলিজের তারিখ ঘোষণা হবার আগে থেকেই বয়কট বলিউড আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত ছবিটি বক্স অফিসে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়। আমিরের বিরুদ্ধে সাধারণ ভারতীয়দের রাগ অবশ্য শুধু লাল সিংহ চাড্ডার কারণে নয়। এর আগে পিকে নামের একটি ছবিতেও আমির মহাদেবকে অপমান করেছিলেন। ছবিতে শিবলিঙ্গকে বাথরুমে বন্ধ করে রাখার দৃশ্য দেখানো হয়েছিল। আমিরের হিন্দু-অ্যালার্জির তালিকা এখানেই শেষ নয়। তিনি যে আগমার্কা মোদীবিরোধী, সে কথা সবাই জানেন। মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর তিনি একাধিকবার 'দেশে অসহিষ্ণুতা বাড়ার' অভিযোগ করেছেন। এমনকী, একবার এ কথাও বলেছিলেন যে তিনি ও তাঁর স্ত্রী ভারতে থাকতে আজকাল ভয় পান। প্রশ্ন হলো, আমিরের ভয়টা কি সত্যি নাকি তিনি ইসলামিক দেশের বাজার ধরার জন্য এসব করেন? তবে কারণ যাই হোক, আমির যে মানসিক ও মেধাগত দাসত্ব থেকে মুক্ত নন তা বলাইবাহুল্য। মুশকিল হলো, আমিরের পিকে বা লাল সিংহ চাড্ডা যারা

দেখেন এবং দেখে মুগ্ধ হন তারাও পরোক্ষে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর এইসব অ্যাজেন্ডার মাধ্যমে প্রভাবিত হন। অর্থাৎ দাসত্ব এক মন থেকে আরেক মনে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও আমিরের দাসত্বের রং আলাদা। তার মনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রং নয়, ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদের রং। ভারতের মঙ্গল-অমঙ্গলের ক্ষেত্রে দুটোই সমান বিষবৎ।

এ প্রসঙ্গে বাঙ্গালি সাহিত্যিকদের কথা বললে নেহাত বেমানান হবে না। তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস (বা আনুগত্য) নানারকমের হলেও একটা জায়গায় তারা সবাই এক। তারা সকলেই ধর্মনিরপেক্ষ। এই ধর্মনিরপেক্ষতা পশ্চিমবঙ্গের অবলুপ্তপ্রায় বইয়ের হেকিমি দাওয়াই কিনা সেটা একটা গবেষণার বিষয়। কারণ এই বঙ্গের হিন্দু বাঙ্গালি লেখক যত ধর্মনিরপেক্ষ (অপ্রচলিত অর্থে হিন্দুবিদ্বেষী) হবেন বাংলাদেশের বইয়ের বাজারে তার রমরমা তত বাড়বে। কেউ কেউ এই ফর্মূলাকে নিউটনের চতুর্থ সূত্র বলে থাকেন। কথাটি যেদিকে ইঙ্গিত করে সেদিকেও মানসিক দাসত্ব আছে। আমাদের প্রিয় সাহিত্যিকদের মানসিক দাসত্ব। বাঙ্গলার সাহিত্য জগতে এখন মধ্যমেধার বাড়বাড়ন্ত। মধ্যমেধার ভিড় যত বাড়ে সিস্টেমের ওপর নির্ভরশীলতাও সমানুপাতিক হারে বেড়ে যায়। সিস্টেম মানে বাংলাদেশের বইবাজার। এই সিস্টেমের চিরবিশ্বস্ত জ্বালানি হিন্দু লেখকের ধর্মনিরপেক্ষতা। এই কারণেই বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হলে পশ্চিমবঙ্গের লেখকেরা চুপ করে থাকেন কিন্তু ভারতে মুসলমানের গায়ে মাছি বসলেও অসহিষ্ণুতার হুজুগ তোলেন।

ভয়াবহ মানসিক দাসত্বের শিকার আমাদের ইতিহাসও। এখনও স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েরা ইতিহাসে পড়ছে, আর্যরা পূর্ব ইউরোপ অথবা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে এসে সরস্বতী সভ্যতার মানুষজনকে মেরেধরে দক্ষিণে পাঠিয়ে উত্তর ভারতে গেড়ে বসেন। বইতে লেখা আছে, বেদে সরস্বতী বলে এক নদীর কথা থাকলেও এই নদী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বেশিরভাগ ঐতিহাসিক মনে করেন সরস্বতী একটি কাল্পনিক নদী। অর্থাৎ একদল দাস মনোভাবের ব্যক্তি সুকৌশলে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর মনে দাসত্বের ভাবনা ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তারা জানেন কিনা জানি না, মেকলের শিক্ষানীতির পরিপূরক হিসেবে ম্যাক্সমুলার আর্য আক্রমণ তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। এবং সরস্বতীকে ঋষিদের কল্পনা হিসেবে প্রতিপন্ন করেছিলেন। কিন্তু কেন করেছিলেন? প্রথম কারণ, বিশ্বের তিনটি অ্যাব্রাহামিক ধর্মমত খ্রিস্টান, ইসলাম ও জুডাইজমের জন্ম মধ্য এশিয়ায়। আবার মেসোপটামিয়ান সভ্যতার জন্মও মধ্য এশিয়ায়। ইউরোপীয়রা মেসোপটামিয়ার থেকে প্রাচীন কোনও সভ্যতা পৃথিবীতে থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করত না। তাই আর্যদের ভারতে আগমনের সময় নির্ধারিত হয়েছিল ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এবার দ্বিতীয় কারণ। হিন্দু ধর্মের শেকড় ছড়িয়ে আছে বেদে। সেই বেদ আর্যদের রচনা। আর্যরাই যদি এ দেশে বহিরাগত হয় তা হলে তো বেদ, পুরাণ, হিন্দু, হিন্দুত্ব— সবই এ দেশে বহিরাগত হয়ে গেল, তাই না?

সাধারণ ভারতীয়রা যদি বহিরাগত আর্যদের শাসন মেনে নিতে পারে তা হলে বহিরাগত ইংরেজদের শাসন মানতে তাদের অসুবিধে কোথায়। হিন্দুদের বহিরাগত প্রমাণ করে মুসলমানদের ভরসা দিল ব্রিটিশ। সেই সঙ্গে সরস্বতী সভ্যতাকে (হরপ্পা সভ্যতা) দ্রাবিড়দের (দক্ষিণ ভারতীয়) সভ্যতা বলে ভারতে আর্য ও দ্রাবিড়ের মধ্যে একটা সংঘাত সৃষ্টি করা হলো। এই সংঘাত এখনও চলছে। সরস্বতীকে কাল্পনিক বলার কারণটি আরও গভীর অর্থবহ। ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুযায়ী সরস্বতী শুকিয়ে গেছে ১৯০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ নাগাদ। ম্যাক্সমুলারের নিদান, আর্যরা ভারতে এসেছে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। কিন্তু আর্য ঋষিরা সরস্বতীর বর্ণনা দিতে গিয়ে তাকে 'নদীতমে' বলেছেন। অর্থাৎ সরস্বতীর সঙ্গে। জরাথুস্টিয়ানদের (পার্শিদের) ধর্মগ্রন্থ জেন্দ অ্যাবেস্তাতেও পাওয়া যাবে এই কথার সমর্থন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যে নদী শুকিয়ে গেছে তাকে হঠাৎ আর্য ঋষিরা খামোখা 'নদীতমে' বলতে গেলেন কেন? এ প্রশ্নের একটাই উত্তর হয়। আর্য ঋষিরা যে সরস্বতীর বর্ণনা দিয়েছেন তা বহাল তবিয়তেই ছিল। অর্থাৎ সেটা ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নয়, ৮০০০ থেকে ৬০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী কোনও সময়ের ঘটনা। এরপর ট্যাকটোনিক শিফটের কারণে সরস্বতীর দুই শাখানদী যমুনা ও শতদ্রুর খাত বদলে যায় এবং সরস্বতীর জলের অন্যতম প্রধান উৎস হিমালয়ের বরফ গলা জলের ঘাটতি দেখা দেয়। আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাতও কমতে থাকে। শেষমেশ ১৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ একেবারে শুকিয়ে যায় সরস্বতী। সুতরাং সরস্বতীকে স্বীকার করলে বাইবেলের কালপঞ্জীকে অস্বীকার করতে হতো। মেনে নিতে হতো ভারতীয় সভ্যতা মেসোপটামিয়ার থেকেও প্রাচীন। তাই বেদ ঐতিহাসিক কিন্তু বেদের সরস্বতী নদী কাল্পনিক। আমাদের ইতিহাস লেখকেরা এসব কথা জানেন না, তা নয়। কিন্তু সত্যি কথা লিখলে কোনও এক প্রভু অসন্তুষ্ট হবেন, সেই কারণে চেপে যান।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রধানমন্ত্রী মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার অনুরোধ করেছেন। একটি দেশের মধ্যে দুটি দেশ থাকা কোনওভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়। ব্রিটিশ রাজশক্তি নিজের স্বার্থে ইন্ডিয়াকে বানিয়েছিল। স্বাধীন হবার পর ভারতের আর ইন্ডিয়াকে প্রয়োজন নেই। নিজেকে ভারতীয় বলার মধ্যে যে গর্ব আছে তা ইন্ডিয়ান বলার মধ্যে একেবারেই নেই। কারণ সেখানে আজও উপনিবেশের কলঙ্ক আছে। কোথাও যেন নিজেকে ইংলন্ডেশ্বরীর প্রজা ভাবার হীনমন্যতা আছে। স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকের মনটিও স্বাধীন হবে— এমনটাই আশা করে আধুনিক পৃথিবী। ভারত কেন তার ব্যতিক্রম হবে। □

With Best Compliments from -

A

Well wisher

গজবা-ই-হিন্দের ভাইরাস
দোভালের ভ্যাকসিন

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

'মাসিক মদীনা' আর প্রকাশিত হয় না। মুসলমান সমাজকে গোঁড়ামি মুক্ত করতে একটা সময় বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হতো। মোল্লাবাদের ধারালো অস্ত্রের কোপে এখন সলমন রুশদি জীবন-মৃত্যু সংকটে। ধর্মান্ধ ইসলামের মূঢ় পাশবিকতাকেই প্রমাণ করেছে।

যদি উদয়পুরের কানহাইয়ালালের শিরচ্ছেদের বীভৎসতার ঘটনার নেপথ্যে যাই তবে বোঝা যাবে ধর্মীয় নৃশংসতা এবং মোল্লাবাদের ঘুম-বড়িতে হিন্দু এবং ভারত

ধর্মগুরুদের সঙ্গে অজিত দোভালের বৈঠক।

আমাদের পুরো সভ্যতাই যে সংকটে।

মোল্লাবাদী সন্ত্রাস প্রতিদিন নতুন নতুন শব্দবন্ধের জন্ম দিচ্ছে। মোল্লাবাদী সন্ত্রাসেও 'lone wolf' শব্দের আগমন ঘটেছে। পর পর তিনটে ঘটনা যদি দেখি, ৩১ জুন উমেশ কোলের শিরচ্ছেদ করে তারই পরিচিত ইউসুফ খান, ২৮ জুন উদয়পুরের কানহাইয়ালালের শিরচ্ছেদ এবং ২৬ জুলাই দক্ষিণ কন্নড়ের ভারতীয় জনতা পার্টির যুবমোর্চার কার্যকর্তা প্রবীণ নেত্তারুর শিরচ্ছেদ করে প্রবীরেরই দোকানের কর্মচারীর পুত্র শফিক। ধর্মমোহে আজ 'অদ্ভুত আঁধার এক', এ এক বিষম 'সভ্যতার সংকট'। ভারতের বুকে মোল্লাবাদের ঘৃণ্য বর্বরোচিত ঘটনা বিদ্বেষের নেশা কী মাত্রায় বুঁদ করে রেখেছে ওদের। মহম্মদ রিয়াজ ও ঘাউস মহম্মদ যারা হাসতে হাসতে একটি নিরীহ মানুষ কানহাইয়ালালের শিরচ্ছেদ করল, তার ভিডিয়ো রেকর্ড করে প্রকাশ পর্যন্ত করল, —তারা কি তবে কোনো টেরর নেটওয়ার্কের কর্মী? না, নয়। না আছে তাদের কোনো সেনা প্রশিক্ষণ, না আছে কোনো কৌশল বুদ্ধি। আলকায়েদা পাকিস্তান নিত্যদিন নানান সামাজিক মাধ্যম এবং তথ্য প্রযুক্তিগত পদ্ধতিতে নতুন নতুন মুসলমান তরুণদের মাথা মুড়িয়ে তাতে এমন ভারত বিদ্বেষী পুরিয়া ভরে দিচ্ছে যা একজন হিন্দু প্রতিবেশীর মুণ্ডচ্ছেদেই তৃপ্তি যোগ করে। একে বলে 'সেল্ফ রেডিক্যালাইজেশন'-এরও গল্প জঞ্জালে ভরা।

যদি ঘাতক ঘাউস মহম্মদের দিকে তাকাই, তবে দেখা যাবে, ২০১৪-র ডিসেম্বর ও ২০১৫-র ফেব্রুয়ারির মধ্যে সে করাচির 'দাউত-ই-ইসলামি'র মুখ্য কার্যালয়ে মগজ-ওষুধ নিতে গিয়েছিল। ভারতের মাটিতে মোল্লাবাদী সন্ত্রাসের বিষবাষ্পের অনুঘটক পাকিস্তান। উল্লিখিত পাকিস্তানি সংগঠন কার্যালয়ের ইতিহাস মোটেই সুখকর নয়। ২০১১-তে পঞ্জাবের (পাকিস্তান) গভর্নর সালমান তাসহিরের হত্যা এবং ২০২০-তে ফ্রান্সের কৌতুক পত্রিকা চার্লে হেবডোর আক্রমণের মাস্টারমাইন্ড ছিল 'দাউত-ই-ইসলামি'। এরা নানান পদ্ধতি প্রক্রিয়া এবং পথে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মেঘনাদের মতো ক্রিয়াশীল, বিষাক্ত জাল বিস্তার করছে প্রতিদিন।

আমাদের দেশের সমস্যা মোল্লাবাদ কিন্তু আরও বড়ো সমস্যা হলো মোল্লাবাদের পক্ষে পরোক্ষ সাফাইওয়ালার ক্রমবর্ধমান সংখ্যা। 'দাউত-ই-ইসলামি'র সঙ্গে যখন সন্ত্রাস যোগ নিয়ে বিপুল চর্চা চলছে, ঠিক তখনই উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ের জামিয়াতুল ফালহয়া-র ডাইরেক্টর মহম্মদ তাহির মাদানি মন্তব্য করেন, 'to associate any organization with terror is a big allegation and it must be corroborated first... !'

তিনি একজন ভারতীয়, তবুও একটা জেহাদি কার্যকলাপের আঁতুড়ঘরে ঢিল ছুঁড়তে বাধা দিচ্ছেন। স্বাভাবিক জিজ্ঞাসার উদ্রেক হবে— কিন্তু কেন? তিনি যে প্রাঙ্গণের ডাইরেক্টর বিগতদিনে তা বেশকিছু SIMI নেতার জন্ম দিয়েছিল। তাই হিসেব জলের মতো পরিষ্কার, কেন মহম্মদ মাদানির মতো মানুষরা প্রথমে মোল্লাবাদী, তারপর মুসলমান এবং কেবলমাত্র ভোটব্যাংকে ভারতীয়। যারা ধর্মান্ধতা নিঃসৃত সন্ত্রাসের বীভৎসতায় ধর্মাচার করে। পাকিস্তান উগ্রবাদের মগজগ্রাফ এদেশে বিস্তার করেই চলেছে। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়কে deprivation তত্ত্ব শুনিয়ে শুনিয়ে ভারত-বিদ্বেষী এবং হিন্দু বিরোধী করে তোলা প্রত্যেকটা জেহাদি সংগঠনের মূল লক্ষ্য। বেনিয়মে অর্থ জোগান চলছে অনর্থ সাধনের প্রচেষ্টায়। যার মধ্যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এক কৌশলী মাধ্যম।

কখনও মানবাধিকারের নামে, তো কখনও গ্লোবাল সিভিল সোসাইটির শিখণ্ডির অন্তরালে চলছে জিহাদতন্ত্রের মুক্ত বিচরণ। আমরা কি ভুলে গেলাম খুর্‌র পারভেজের ঘটনা! যিনি বিগত দু' দশক ব্যাপী জম্মু-কাশ্মীর কোয়ালিশন অব সিভিল সোসাইটির ছদ্মনামে, সমাজসেবার আড়ালে পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠনের যোগে কাশ্মীরের মুসলমান যুবকদের মাথা চিবিয়েছেন। পাকিস্তান জঙ্গি সংগঠন হিজবুল মোহাজিদ্দিনই ছিল ওদের অনুপ্রেরণা ঘর। শুধু এখানেই থেমে ছিল না পারভেজের ভারত বিদ্বেষী মন্ত্র বিস্তার।

এ বিষয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘেও ভারত জোরালো সওয়াল করেছে। মানবাধিকারের স্টিকার দেওয়া স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং তার আড়ালে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের যোগ যে ইউনাইটেড নেশনস সিকিউরিটি কাউন্সিলের Sanction regimes-এর উপহাস ব্যতীত আর কিছুই না! এবং এ বিষয়ে গত ৮ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি টি এস ত্রিমূর্তি সরব হন। বিগতদিনেও এনআইএ (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি) যখনই জঙ্গি সংগঠনের ঘাঁটির সন্ধান পেয়েছে তখনই তার সঙ্গে একাধিক সমাজসেবারত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যোগসূত্রের সন্ধান মিলেছে। যেমন, মুম্বই জঙ্গি হামলার মাস্টারমাইন্ড হাফিজ সাঈদের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ফালহা-ই- ইনসানিয়াত সমাজসেবার মুখোশে দিব্যি ছিল। পুলওয়ামা জঙ্গি আক্রমণের পর রাষ্ট্রসঙ্ঘে এই সমাজসেবী সংস্থার বিরুদ্ধে ভারত তীব্র ভাবে সরব হলে পাকিস্তান অর্থ যোগ বন্ধ করে এবং সংস্থাটির অনুমোদন বাতিল করে। এনআইএ নিরন্তর অক্লান্ত দেশসেবায় ব্রতী। এনআইএ প্রধান অজিত দোভাল সন্ত্রাসীদের জুজু। তাঁর নতুন নতুন স্ট্রাটেজিতে কুপকাত হয়েছে লস্কর-ই-তৈবা প্রধান হাজিফ সঈদ থেকে শুরু করে কাশ্মীর বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ইয়াসিন মালিক, সবির শাহ, মাসরত আলম, হিজবুল-মুজাহদ্দিন শীর্ষ নেতা সঈদ শালাউদ্দিন-সহ আরও অনেকে। একটা সময় ছিল যখন উগ্রবাদ প্রচারের জন্য একটা পোড়ো বাড়ি লাগত। মাথা মুড়িয়ে ধর্মান্ধতার ড্রাগে মত্ত করতে ক্লাস নিতে হতো। সময় লাগত। কিন্তু আজকে ইন্টারনেটের যুগে একজন স্কুল ছাত্রকেও তার মোবাইলের মাধ্যমে সেই আফিম সরবরাহ করা যাচ্ছে খুব সহজেই। যে lone wolf টেরর দিয়ে নিবন্ধর অবতারণা— তা আজকে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ।

২০২০-র ফ্রান্সের নাইসে আক্রমণ কিংবা ২০১৬-র ফ্লোরিডার সমকামী ক্লাবে একা ওমর মাতিনের সন্ত্রাসী হামলার আড়ালে ছিল ইন্টারনেটে ধর্মান্ধতা শিক্ষা (পড়ুন, কু-শিক্ষা)-র প্রচার। ট্রেনিং চলত আলকায়েদার পক্ষ থেকে। তাই বিশেষ কারণে সংবেদনশীল অঞ্চলে যখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা দপ্তর ইন্টারনেট পরিষেবায় উল্কাগতিতে কিছুক্ষণের লাগাম দেন, তখনই মানবাধিকার সংস্থাগুলি লাগামহীন আন্দোলন জুড়ে দেয়। ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার সূত্র খুঁজে বার করেন আন্দোলনজীবীরা। যখন আমাদের দেশে সংবিধানের অপব্যবহার হয় তখনই তা অপকর্মের জন্ম দেয়। তাই অজিত ডোভাল নিরন্তর চেষ্টা করেই যাচ্ছেন, সাফল্য আসছে, কিন্তু সন্ত্রাসমুক্ত দেশ এখনও একটা চ্যালেঞ্জ। বিভিন্ন ধর্মগুরুদের সঙ্গেও অজিত দোভাল সদর্থক বৈঠক করছেন কিন্তু আমাদের দেশের সমস্যা অতি-গণতন্ত্র প্রিয় বিরোধিতা যা জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে যাক তবু যেন রাজনীতি রাষ্ট্রনীতির ঊর্ধ্বাসনে থাকে। এ সমস্যা সন্ত্রাসবাদের মতোই বিষম সমস্যা এবং এটাই জেহাদিদের ইন্ধন। ২০১৯-এ যখন সংসদে অ্যান্টি টেরর বিল প্রস্তাব আসে, যখন নিম্ন কক্ষে তা উত্তীর্ণ হয়, অমনি কংগ্রেসের সাংসদগণ তুমুল বিতর্ক বর্ষণ ঘটিয়ে দাবি করেন Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act Bill-কে স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পাঠাতেই হবে।

জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিকে সচেষ্ট হতে হবে। কেরল সবচেয়ে শিক্ষিত রাজ্য বলে দাবি করে। তবে সে রাজ্যে কেন এতো জঙ্গি ঘাঁটি? ২০১৮-তে যখন ২৬ বছর বয়সি কলেজ ছাত্র নাসিদহুদ হামজাফরের সঙ্গে 'আইসিস'-এর জঙ্গি যোগ প্রমাণ করল এনআইএ— তখন বোঝা গেল ধর্মান্ধতার ময়াল সাপ কতো দূর পর্যন্ত গ্রাস করেছে। এই সব ছোট্ট ছোট্ট ছেলেদের বিপথগামী করছে জাকির নায়েকের পিস ফাউন্ডেশন। ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন ওদের রুটিন করে ক্লাস নেয়। রপ্ত করায় দেশদ্রোহিতার পাঠে। হিন্দু বিদ্বেষী মন্ত্রে রোজ দীক্ষা দেয়। আফগানিস্তান, সিরিয়ায় 'সেমিনারে' যায় ওরা। সেমিনারের শিক্ষার প্রয়োগ চলে উদয়পুরের কানহাইয়ালালের ওপর কিংবা দিল্লির শাহিনবাগে। একটা ছুঁতো খোঁজার দরকার লাগে এই ধরনের মগজ ধোলাই ট্রেনিং সেন্টারের। যে ছুঁতো ভারতীয় মুসলমানদের যুক্তিহীন উত্তেজনায় উত্তাল করবে। তা সে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন হোক কিংবা হিজাব বিতর্ক। কেরলের পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া (পিএফআই) এমনই আরও এক মগজ ধোলাই প্রতিষ্ঠান যারা জন্মই নিয়েছে SIMI-র থেকে। যারা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিরুদ্ধে প্রচার চালায়। পিএফআই কখনও ক্যাম্পাস ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া নামক ছাত্র লিগের নামে, আবার কখনও সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অব ইন্ডিয়া নামক রাজনৈতিক দলের মুখোশে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুঘুর বাসা বানাচ্ছে। ২০১০ সালে কেরলের ইদ্দুকি জেলার

পি এফ আই-এর নিজস্ব সেনা প্রশিক্ষণ।

অধ্যাপক টিএস জোশেফের হস্ত ছেদন থেকে সঙ্ঘের কার্যকর্তা আর রুদ্রেশের নৃশংস হত্যা, বিহারের ফুলওয়ারি শরিফে জঙ্গি আক্রমণ কিংবা জাতীয়তা- বিরোধী যে কোনো আন্দোলনে অর্থ ও উত্তেজনার রসদ দেয় এই সংগঠন। পিএফআই অজুহাত দেয় যে তারা প্রান্তিক মানুষের স্বার্থে কর্মরত, অর্থাৎ সেই ভেকধারী সমাজসেবা মডেল। পিএফআই দাবি করতেই পারে যে তারা সমাজের পক্ষে কাজ করছে, কিন্তু তথ্য অন্য উত্তর দেবে। ২০০৮ সালে ব্যাঙ্গালোর বিস্ফোরণে যে আবদুল নাসির মাদানির নাম আসে সে তো এই স্কুলেরই ছাত্র। আরও অনেক কৃতী জঙ্গি ছাত্রের জন্ম দেয় এই সংগঠন। টাটকা উদাহরণ শাখহিরুল রহমান, সাবহি খান ও আরসাদ, যারা লক্ষ্ণৌতে অ্যান্টি সিএএ রায়ট তৈরি করেছিল। জাফারবাদ রায়টেরও পরিচালক ছিল পিএফআই।

এই রায়টের পর এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট অন্ততপক্ষে ৭৩টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১২০ কোটি টাকার সন্ধান পায়। যার মধ্যে ৭টি ছিল রিহাব ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের। ২৬/১১ মুম্বই আক্রমণেও এদের যোগ ছিল বলে ধারণা।

কেমন শিক্ষা দেয় পিএফআই? নিবন্ধের শেষে একটু আলোচনা করলেই ষোলো কলা পূর্ণ হবে। ১০ মে ২০২০-তে এক অনলাইন কনফারেন্স করে যার শীর্ষক ছিল 'National lockdown Fascism- Unmask the Hidden Agenda'— কমপক্ষে ১০ হাজার ছাত্র এতে যোগ দেয়। যে আলোচনার মূল দাওয়াই ছিল 'কেন্দ্রের বিরোধিতা'। তীব্র হিন্দু বিদ্বেষ প্রসব করে এই কনফারেন্স। সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় এই যে পিএফআই-এর সাধারণ সম্পাদক আনিস আহমেদ আরোগ্য সেতু অ্যাপ বর্জন করতে বলেন। সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হলো আগামী ২০৪৭-এর মধ্যে ভারতকে ইসলামিক দেশ বানানোই পিএফআই-এর মূল লক্ষ্য। গত ৭ মে তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আরএন রবি 'The lurking Hydra : South Asia's Terror Travail' (লেখক লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুব্রত মিত্র) বইটি উদ্বোধনের সময় বলেন, 'The Popular Front of India is a very dangerous organization. It has more than 16 fronts, mask of human rights, mask of rehabilitation, mask of being a student organisation, it takes the form of political party. But its whole aim is to destabilise this country' এবং রাজ্যপাল এও বলেন বেশ কিছু রাজনৈতিক দল তাদের স্বার্থে এদের সমর্থন করছে। আলট্রা ইসলামিক অপশক্তি আমাদের দেশের সার্বিক সুরক্ষা বলয়ের চেয়ে শক্তিশালী হতে পারবে না ঠিকই কিন্তু দেশের নিরবচ্ছিন্ন অভ্যন্তরীণ সুরক্ষায় প্রতিবন্ধকতা তো বটেই।' Terrorism has to be fought and fought without reservation--- 'জুন মাসে BRICS বৈঠকে অজিত দোভাল যা বলেছিলেন তা দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা স্বার্থেও সমান ভাবে প্রযোজ্য। 'যে গোঁড়ামি সত্যেরে চায়/সুধায় রক্ষিতে/যত জোর করে, সত্য মরে অলক্ষিতে'—প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল এবং অচলায়তন ধর্মবিশ্বাস যেন একটা বার এই শিক্ষা নেয় 'ধর্মাধর্ম সত্যাসত্য/কে করে বিচার! আপন বিশ্বাসে মত্ত করিয়াছ স্থির, শুধু দল বেঁধে সবে/সত্যের মীমাংসা হবে, শুধু উচ্চরবে? যুক্তি কিছু নহে?'

সেই যুক্তিটুকু যেন ইসলামি ধর্মগুরুরা এবং রাজনৈতিক দলগুলি পালন করে। নয়তো সন্ত্রাস দমনের জন্য অজিত দোভাল একাই একশো। □

উত্তরপ্রদেশে ধর্ম যার যার বুলডোজার সবার

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

সম্প্রতি প্রয়াগরাজে জুমার নমাজের পরে হিংস্র ঘটনায় অভিযুক্ত জাভেদ মহম্মদের বাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে, কারণ বাড়ির নকশা অনুমোদিত ছিল না। বাড়ির নকশা অনুমোদন কীভাবে হয়?

উত্তরপ্রদেশের সমস্ত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে বিল্ডিং নির্মাণের উপর নজরদারি এবং ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উত্তরপ্রদেশ নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন আইন, ১৯৭৩ প্রণীত হয়েছে। রাজ্যে কোনও বাড়ি তৈরি করতে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দ্বারা তার প্ল্যান পাশ করা দরকার। এ জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে নকশা দাখিল করা হলে যাচাই করে দেখা হয় ভূমি ব্যবহার আইন অনুযায়ী তা পাশ হওয়ার যোগ্য কি না। অর্থাৎ বাণিজ্যিক এলাকায় বাসাবাড়ির জন্য প্ল্যান বা নকশা দাখিল করা হয়েছে কিনা বা সবুজ বেল্টে কোনো ধরনের নির্মাণের জন্য নকশা জমা দেওয়া হয়েছে কিনা। এসবের প্রেক্ষিতে নকশা সঠিক হলে নির্ধারিত ফি নিয়ে পাশ করানো হয়। কোনো ঘাটতি থাকলে কর্তৃপক্ষ নকশার ত্রুটিগুলো বলেন এবং তা সংশোধন করে জমা দিতে বলা হয়। সব কিছু করার পরে নকশা পাশ করা হয়। এরপর নকশা সরজমিনে তদন্ত করা হয়।

বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। এরপর নকশা-বহির্ভূত কোনও নির্মাণ হচ্ছে না তা নিরন্তর পর্যবেক্ষণ করা হয়। নির্মাণের চারপাশে জায়গা ফাঁকা রাখা হচ্ছে কিনা, তাও দেখা হয়। নির্মাণের সময় নকশা লঙ্ঘন হলে ভবননির্মাণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু এর আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নোটিশ জারি করে জবাব চাওয়া হয়। তিনি সাড়া না দিলে ভেঙে দেওয়ার আদেশ জারি করা হয়। এই আদেশ জারির পর প্রথম আপিল মণ্ডল কমিশনারের কাছে করতে হয় এবং সরকারের কাছে দ্বিতীয় আপিলের সুযোগ থাকে। এখানে কোনো ত্রুটি পেলে কর্তৃপক্ষ বাড়িটি ভাঙার ব্যবস্থা নিতে পারে।

২

প্রয়াগরাজ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এলাকায় প্রায় আড়াই লক্ষ বাড়ি আছে। এর মধ্যে প্রায় চল্লিশ হাজারের কোনো নকশাই নেই। এখানে গত ১০ জুন সহিংসতার দায়ে অভিযুক্ত জাভেদ মহম্মদের বাড়ি ভাঙার ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে। কর্তৃপক্ষ বলছে যে জাভেদকে এক মাস আগে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তার কোনও উত্তর না পাওয়ার পরে বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়েছে। অন্যদিকে জাভেদের পরিবার জানায়, বাড়িটি বহু বছর আগে তৈরি করা হয়েছে। তারা কখনো কোনো নোটিশ পাননি।

৩

উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ ও সাহারানপুরে সহিংস বিক্ষোভে অভিযুক্তদের বেআইনি ভাবে নির্মিত সম্পত্তি ভেঙে ফেলার জন্য বুলডোজার রাস্তায় নেমেছে। জেলা কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য রাজ্যের সাধারণ বুলডোজার 'অ্যাকশন রুট' বা কর্মপন্থা ব্যবহার করেছে। এখনও পর্যন্ত সহিংসতার অভিযুক্তদের অন্তত তিনটি সম্পত্তি ভেঙে দেওয়া হয়েছে—একটি প্রয়াগরাজ এবং দুটি সাহারানপুরে।

উত্তরপ্রদেশের কথিত দাঙ্গাবাজদের উপর যোগী আদিত্যনাথের বুলডোজারের পদক্ষেপে চোখ রেখে দেখা যাক :

প্রয়াগরাজ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (পিডিএ) পুলিশ প্রহরায় ১০ জুন ২০২২ সহিংসতায় অভিযুক্ত জাভেদ আহমেদ ওরফে 'পাম্পে'র প্রয়াগরাজের কারেলি এলাকায় অবস্থিত বাড়ি, জে কে আশিয়ানা ভেঙে দিয়েছে। পুলিশ বাহিনী ও একটি জেসিবি মেশিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ কারেলি থানায় পৌঁছায় এবং দুপুর ১টার দিকে ভাঙচুর শুরু হয়। বাড়িটা কেন ভাঙা

দাঙ্গাবাজ জাভেদ আহমেদ খানের বাড়ি ভাঙছে বুলডোজার।

বিজেপি নেতা শ্রীকান্ত ত্যাগীর অবৈধ বাড়ি ভাঙছে বুলডোজার

হয়েছিল? বাড়িটি পিডিএ-র পাশ করা নকশা ছাড়াই তৈরি করা হয়েছে। এর জন্য, তাকে ১০ মে নোটিশ জারি করা হয়েছিল এবং ২৪ মে তাকে বক্তব্য উপস্থাপন করতে বলা হয়েছিল। সেই তারিখে জাভেদ বা তার আইনজীবী কেউই আসেননি। এ বিষয়ে কোনো দলিল উপস্থাপন করা হয়নি। 'অতএব ২৫ মে বাড়ি ভাঙার আদেশ জারি করা হয়েছিল' পিডিএ কর্মকর্তা বলেছেন। অর্থাৎ বাড়ি ভাঙা হয়েছে আইনি পথে এবং তার পরেই জাভেদ দাঙ্গা করেছে। একটি টুইটে, মুখ্যমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা মৃত্যুঞ্জয় কুমার বলেছেন, 'উচ্ছৃঙ্খল লোকেরা যেন মনে রাখে প্রতি শুক্রবারের পরে শনিবার আসে' এবং বুলডোজার দিয়ে একটা বাড়ি ভেঙে ফেলার ছবি পোস্ট করেন।

৪

সাহারানপুরে বুলডোজার : সাহারানপুরে পাথর ছোড়া হয়েছে, সেই দাঙ্গার অভিযোগে অভিযুক্ত দুই ব্যক্তির সম্পত্তি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সাহারানপুর নগর পুলিশ সুপার রাজেশ কুমার বলেছেন যে দুই অভিযুক্তকে সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছে— রাহাত কলোনির ৬২ ফুটা রোডের বাসিন্দা মুজাম্মেল এবং খাতা খেদির বাসিন্দা আবদুল বাকির। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কর্মীরা তাদের অবৈধ সম্পত্তি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

৫

শুক্রবার মসজিদে জুম্মার নমাজের পরে বিক্ষোভ চলাকালীন প্রয়াগরাজ ও সাহারানপুরে পুলিশ কর্মীদের লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়েছে মুসলমান জনতা।

অন্তত চারটি শহর একই রকম দৃশ্যের সাক্ষী হয়েছিল— নবি মোহাম্মদকে নিয়ে বিজেপির মুখপাত্র নূপুর শর্মার মন্তব্যের প্রতিবাদে করা মিছিলের সময়ে পাথরবাজি করেছে উন্মত্ত মুসলমান জনতা, অথচ শ্রীমতী শর্মাকে বরখাস্ত করা হয়েছে অনেক আগেই।

প্রয়াগরাজে মুসলমান জনতা কয়েকটি মোটরসাইকেল ও গাড়িতে আগুন দিয়েছে এবং একটি পুলিশের গাড়িতে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করেছে। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে এবং শান্তি ফিরিয়ে আনতে কাঁদানে গ্যাস ও লাঠি ব্যবহার করেছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, একজন পুলিশ আহত হয়েছেন।

৬

এরপর দেখে নেওয়া যাক উত্তরপ্রদেশে এই বুলডোজার সবার জন্য প্রযোজ্য, আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে সব নিয়মভঙ্গকারীর জন্য প্রযোজ্য কিনা।

৫ আগস্ট গ্র্যান্ড ওম্যাক্স সোসাইটিতে মারধরের একাধিক ভিডিয়ো এবং একজন মহিলাকে লাঞ্ছিত করার

ফেরার আসামি বিহারের আইনমন্ত্রী

কার্তিকেয় সিংহ বিহারের নীতিশ-তেজস্বী মন্ত্রীসভায় আইনমন্ত্রী হয়েছেন। কার্তিকেয় সিংহ পাটনার এক বিল্ডারকে অপহরণ করার অভিযোগে অভিযুক্ত। বস্তুত যেদিন তার আদালতে আত্মসমর্পণ করার কথা সেদিনই তিনি আদালতে না গিয়ে রাজভবনে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বিহারে। প্রশ্ন উঠেছে একজন ক্রিমিনাল কীভাবে রাজ্যের আইনমন্ত্রী হন? এর আগে আরজেডি-র বাহুবলী নেতা আনন্দ মোহন সিংহের জেল থেকে বেরিয়ে বাড়িতে গিয়ে খোশগল্প করে আসার ঘটনাতেও তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হয়েছিল বিহারে। বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করে নীতীশকুমার আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের সঙ্গে জোট বাঁধার পর থেকেই সাধারণ মানুষের মনে পুরনো স্মৃতি আবার জেগে উঠেছে। সকলেরই আশঙ্কা লালুপ্রসাদ যাদবের জঙ্গলরাজ কি আবার ফিরে এলো? বিহারের ঘটনাক্রমও সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। এখনও পর্যন্ত যা খবর পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, বিহার জুড়ে লুটপাট আর এলোপাথাড়ি খুনখারাবি শুরু হয়ে গেছে। দিদারগঞ্জ টোল প্লাজায় হামলা করেছে ১০-১২ জন মুখোশধারী দুর্বৃত্ত। লুট হয়েছে নয় লক্ষ টাকা। টোলপ্লাজার নিরাপত্তা কর্মীকে ভোজালি দিয়ে কুপিয়েছে দুর্বৃত্তরা। তিনি এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শিমুলতলা ব্লকের জামুইতে গোকুল যাদব নামের এক সাংবাদিককে দিনের আলোয় গুলি করে খুন করেছে দুর্বৃত্তরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, পাঁচজন দুষ্কৃতী দুটি মোটরবাইকে চেপে এসে খুব কাছ থেকে পরপর পাঁচবার গুলি করে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গোকুল যাদবের। এইসব ঘটনা জঙ্গলরাজের স্মৃতি উসকে দিচ্ছে। ১৯৯০ থেকে ২০০০-এর গোড়া পর্যন্ত বিহারে খুন, অপহরণ নিত্যদিন লেগেই থাকত। ২০০৫ সালে বিজেপির সঙ্গে জোট করে নীতীশকুমার সরকার গঠন করেন। বিহারের পরিস্থিতি আমূল বদলে যায়। কিন্তু এখন আবার সেই আগের অবস্থা। আনন্দ মোহন সিংহ খুনের আসামী। অপহরণ করে খুন করার অপরাধে পাটনা হাইকোর্ট তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। পরে সুপ্রিম কোর্ট সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। এমন এক ব্যক্তিকে যদি জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে আরজেডি-র অন্যান্য দাগি নেতাদেরও নিশ্চয়ই ছেড়ে দেওয়া হবে— এমনটাই আশঙ্কা সকলের।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে খেলনা বুলডোজার উপহার দিচ্ছেন এক অনুরাগী।

আগে বিজেপির সমর্থক শ্রীকান্ত ত্যাগী সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। ৫ আগস্ট এক মহিলার সঙ্গে ত্যাগীর অভব্য ব্যবহার সোশ্যাল মিডিয়াতে আসার সঙ্গে সঙ্গে সমাজবাদী পার্টি শোরগোল ফেলে এবং তিন দিনের মধ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। শ্রী ত্যাগী গাছ লাগাতে উদ্যোগী হলে ওই মহিলা প্রতিবাদ করেন যে-কোনও জায়গায় গাছ লাগানো যায় না। তখন বচসার সময়ে ত্যাগী মহিলাকে ধাক্কা দিলে মহিলাও চড় মারতে যান। শেষ পর্যন্ত কোনো শারীরিক নিগ্রহ হয়নি। বিজেপির দলীয় তরফে জানানো হয়েছে শ্রী ত্যাগী কোনো ভাবেই বিজেপি দলের কোনো পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। তবে বিজেপি সমর্থক। কিন্তু যোগীজীর আদেশে উত্তরপ্রদেশ সরকার ত্যাগীর বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধ ৩৫৪, ৪১৯, ৪২০ ও ৪৮২-ধারার অধীনে অভিযোগ আনা হয়েছে। সূত্রের খবর, গত কয়েকদিন ধরে পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশ ৮টি টিম গঠন করেছে। ত্যাগীর একাধিক সম্পত্তিতে তল্লাশি চালাবে তারা। পুলিশ তাকে গ্যাংস্টার অ্যাক্টের অধীনে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং নিশ্চিত করেছে যে তার সমস্ত অবৈধ সম্পত্তি চিহ্নিত করা হবে। ১২ আগস্ট আদালত ত্যাগীকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

৭

যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বাধীন সরকার বিজেপির শ্রীকান্ত ত্যাগীর অবৈধ দখল ভেঙে দিলে নয়ডার গ্র্যান্ড ওম্যাক্স সোসাইটিতে উৎসব শুরু হয়। উল্লেখযোগ্য ভাবে, ৮ আগস্ট নয়ডা কর্তৃপক্ষ নয়ডার গ্র্যান্ড ওম্যাক্স সোসাইটিতে শ্রীকান্ত ত্যাগীর বাসভবনে গিয়ে বুলডোজার দিয়ে অবৈধ কাঠামো ভেঙে দিয়ে অবৈধ নির্মাণ বন্ধ করে দেয়।

নয়ডার হাউজিং সোসাইটিতে ত্যাগীর বাসভবন বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলার সময় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানায় জনসাধারণ। সমাজের মানুষ একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে বুলডোজারের কর্মকাণ্ড সমর্থন করেছে এবং বলেছে যে এই পদক্ষেপ তাদের প্রতি সরকারের সমর্থন প্রমাণ করে।

সোসাইটির একজন সদস্য ত্যাগীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়ে রিপাবলিক টিভিকে বলেছেন, 'আমরা খুশি। মনে হচ্ছে আমরা ভয় থেকে বেরিয়ে এসেছি। এখন আমরা অনুভব করছি যে কেউ আমাদের সমর্থন করেছে এবং আমরা সঠিক নেতাকে (যোগী আদিত্যনাথ) বেছে নিয়েছিলাম'।

অন্য একজন সদস্য বলেন, 'আমরা এই কর্মকাণ্ডে খুশি কারণ ওই ব্যক্তি একজন গুন্ডা এবং অবৈধ দখল করেছে। যত দ্রুত সম্ভব তাকে গ্রেপ্তার করা উচিত।

সোসাইটির এক বাসিন্দা বলেন, 'আজ এই সমাজের মানুষ সত্যিই খুব খুশি। কারও ক্ষতি হলে মিষ্টি বিতরণ করা হয় না, কিন্তু যেহেতু মানুষ দুঃখ পেয়েছিল এবং এখন তারা ভালো জিনিস দেখতে পেয়েছে (বুলডোজার অ্যাকশন), আমরা মিষ্টি দিয়ে উদ্‌যাপন করছি'। □

স্বাধীন দেশের নাগরিক- এটাই আমাদের গর্ব

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ একসময় সম্পদে ও ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ছিল। তাই অতীতে বারে বারে আমাদের দেশকে বিভিন্ন জাতি আক্রমণ করেছে ও লুঠ করেছে। তখনকার ভারতবর্ষে সামন্ত প্রথা বা জমিদারি প্রথায় দেশ শাসন করা হতো। আমাদের দেশ তখনও সুজলা, সুফলা, শষ্য-শ্যামলা ছিল। বাণিজ্য করতে এসে ইংরেজরা এদেশের শাসনকর্তা হয়ে উঠলেন। প্রায় দুশো বছর ধরে ইংরেজরা আমাদের দেশ শাসন করেছে। আমাদের দেশের নাগরিকদের ওপর তারা বিভিন্নভাবে অত্যাচার করতো, শোষণ করতো। এমনকী বাক্ স্বাধীনতা পর্যন্ত ছিল না।

শত শত শহিদের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে ও অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দ্বারা দুশো বছর পর ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমাদের দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৯ সালের ২৬ জানুয়ারি আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে বিশ্বে পরিচিত হয়। আজ আমরা ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবস পালন করছি। এখনও 'জয় কিষান, জয় জওয়ান' এই স্লোগানের মর্যাদা দিতে পারিনি। কৃষিপ্রধান দেশের কৃষকদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আসেনি। অধিকাংশ সময় ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে নতুবা ঋণের দায়ে কৃষকরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। দেশ মায়ের রক্ষাকর্তা জওয়ানদেরও যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয়নি। এখনও অনাহারে আমাদের দেশের মানুষের মৃত্যু হয়।

সব মানুষের মৌলিক অধিকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্য এখনও সুরক্ষিত করতে পারেনি। সাত দশকের স্বাধীনতায় দেশ হয়তো অনেকটা এগিয়েছে। আমরা এখন আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগে বাস করছি, ঘরে ঘরে মোবাইল, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, নেটওয়ার্কিং যোগাযোগ ব্যবস্থা সবকিছুরই অনেকখানি উন্নতি হয়েছে কিন্তু এখনও সব মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুরাহা হয়নি। দেশে জঙ্গি হানা, সন্ত্রাসবাদ অনেকটাই কমেছে। কিন্তু দেশে বেড়েছে গণপিটুনির নামে বর্বরতা আর গোষ্ঠীর লড়াই। এমনকী খুন, ধর্ষন, রাহাজানি ভয়াবহ আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাত দশকের স্বাধীনতায় এখনও নারীর সম্মান রক্ষা ও সুরক্ষা দিতে পারেনি।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা যাদের নির্বাচিত করি তারা আমাদের রক্ষাকর্তা কিন্তু বাস্তবে তারা আমাদের জন্য কতটুকু সময় ব্যয় করেন? আজ স্বাধীন ভারতের নাগরিক হয়েও আমরা সবাই নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারি না। আমরা এখন হয়তো ইংরেজেদের থেকে স্বাধীন কিন্তু গণতান্ত্রিকভাবে কতটা স্বাধীন হয়েছি প্রশ্ন থেকেই যায়। সাত দশকের স্বাধীনতায় রাজনৈতিকভাবে বিরোধীরা পরাধীন। সাত দশকের স্বাধীনতায় এখনও ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুরোপুরি ফিরিয়ে আনা যায়নি। মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে অর্থ ও ক্ষমতা কুক্ষিগত, তাই দেশের সব মানুষ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী নয়। দিনের পর দিন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও তার নিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যবস্থা চোখে পড়েনি। রাজ্যের ও দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ বেকার। এখনও ফুটপাথে বহু মানুষ রাত কাটায়। মূল্যবোধ আর মূল্যহীনতায় যুবসমাজকে গ্রাস করে নিয়েছে। এদের কাছে স্বাধীনতা দিবসের ও শহিদের গুরুত্ব হারিয়েছে। সাত দশকের স্বাধীনতায় আমাদের চাওয়া-পাওয়ার যতই ঘাটতি থাক আমরা ভারতবাসী ও স্বাধীন দেশের নাগরিক এটাই আমাদের গর্ব।

–চিত্তরঞ্জন মান্না,
চন্দ্রকোনা রোড, পশ্চিমমেদিনীপুর

দেশভাগের বিভীষিকাময় ৭৫ বছর

'আগে পাকিস্তান দিতে হবে, পরে স্বাধীন হবে'-এই স্লোগান তুলেছিল মুসলিম লীগ। আর এই স্লোগানের কাছে সম্পূর্ণ নতি স্বীকার করেছিল গান্ধী, নেহরু ও কংগ্রেস। তাই ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ সালে বাংলা ও পাঞ্জাবকে টুকরো করে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। অবশ্য গান্ধী, নেহরু, কংগ্রেস গোটা বাংলা ও গোটা পাঞ্জাব পাকিস্তানকে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, ডঃ মেঘনাদ সাহা প্রমুখের ঐকান্তিক চেষ্টায় তারা পাকিস্তানের কাছ থেকে বাংলার এক তৃতীয়াংশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম দেন। সঙ্গে পাঞ্জাবকে টুকরো করে একটা অংশ ভারতের অঙ্গরাজ্য পাঞ্জাব হিসেবে যুক্ত হয়। সেই সময় মুসলিম লীগ দেশভাগ চেয়েছিল মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য। মুসলিম জনগোষ্ঠী ভারতে থাকতে চায়নি। সিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের চেয়ারম্যান ও জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন যথাক্রমে বি আর আম্বেদকর ও যোগেন মণ্ডল। যোগেন মণ্ডল মুসলিমদের সঙ্গে পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন করেন। পরে তিনি পাকিস্তানের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হন। বাবাসাহেব আম্বেদকর পাকিস্তানের দাবি সমর্থন করেননি। পরে যখন দেখেন দেশভাগ হবেই তখন তিনি লোক বিনিময়ের কথা বলেন। অর্থাৎ ভারতের মুসলমানরা পাকিস্তানে যাবে। আর পাকিস্তানের হিন্দুরা ভারতে আসবে। পাঞ্জাব অবশ্য বাবাসাহেবের কথামতো লোক বিনিময় করেছিল। কিন্তু বাঙ্গলা সেই পথে যায়নি। ওপার থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে হিন্দু বাঙ্গালি এপারে এসে রেলস্টেশন ও ফুটপাথে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

কি নিদারুণ নরকযন্ত্রণা তারা ভোগ করেছিল। এদেশে আসার সময় কত রমণীকে ধর্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ধর্ষণের পর বহুজনকে হত্যা করে ধর্ষণকারী দল। সন্তানের চোখের সামনে মা'কে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ করে ঐ নারী পিপাসুরা। কি অপরাধ ছিল ওই নিরীহ মানুষদের? রাতারাতি তারা অন্য দেশের নাগরিক হয়ে গেল!

সেদিন এই পশ্চিমবঙ্গের জন্ম হয়েছিল হিন্দুদের শান্তিতে থাকার জন্য। শান্তিতে ধর্মপালনের জন্য। এই ৭৫ বছরে দিনে দিনে

ফঃ ৩

এখানকার হিন্দুরা কোণঠাসা হয়েছে। আজ তো সরকারি মদতে হিন্দুদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করা হচ্ছে। ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বাধা দেওয়া হচ্ছে। পূজা উদ্‌যাপনেও নানাবিধ বাধা দেওয়া হচ্ছে। সুপ্রিমকোর্ট রোহিঙ্গাদের তাদের নিজেদের দেশে পাঠানোর কথা বললেও রাজ্য সরকার তাদের এখানে জামাই আদরে রেখেছে। তারাই ভোটের সময় তৃণমূলের হয়ে ভোট লুঠ করছে। সত্যি কথা বলতে হিন্দুরা অনেকেই হিন্দু ভাবনা ত্যাগ করে নিজেদের প্রগতিশীল বলে দাবি করে। যখন যখন তারা বিপদে পড়ছে তখনই তারা আরএসএস বা বিজেপির খোঁজ করছে। আমাদের এর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আর জেগে ঘুমোলে চলবে না।

—শ্যামলকুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯

জনজাতি সমাজের নারী জাগরণ

গত ১ আগস্ট স্বস্তিকা পত্রিকায় অঙ্গনা বিভাগে মৌসুমী সরেনের লেখা পড়ে খুব ভালো লাগল। ভারতবর্ষে আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের অধিবাসীরা তাদের নিজ সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রকৃতির পুজো করে এবং প্রকৃতিকে ভালোবেসে বনজঙ্গলের নিবিড় প্রকৃতির মধ্যে তারা বসবাস করে। নিজ জীবিকা অর্জনে তারা একদম স্বাধীন। এই আদিম অধিবাসীদের নিজস্ব পূজা-পার্বন, আচার-অনুষ্ঠান, এমনকী তাদের নিজস্ব ভাষা অলচিকি একদমই অন্যরকম স্বাধীন জীবনযাত্রার পরিচয় বহন করে। সাঁওতাল নারীদের জীবিকার ক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে সম পরিশ্রমে যোগ্যতা অর্জন করেছেন। সাঁওতাল রমনীরা খুবই সুশৃঙ্খল।

এই প্রোটো অস্টলয়েড সম্প্রদায়ের মানুষেরা স্বভাবে খুবই নীরিহ প্রকৃতির হয়। সাঁওতাল রমনীদের সংগীত ও নৃত্য এবং ধামসা-মাদল ও বাঁশির সুর আধুনিক সভ্যতাকে অনেক এগিয়ে দিয়েছে। অনেক সিনেমাতে তাদের নাচ এবং সুমধুর সংগীত ব্যবহার করা হয়েছে।

তাদের ভাষা অলচিকি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করেছে। রাজনীতির অলিন্দেও তারা সফলতা অর্জন করেছেন। ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি একজন সাঁওতাল রমণী এটা আমাদের সমগ্র ভারতবাসীর কাছে অত্যন্ত গর্বের। আধুনিক সমাজে সাঁওতাল নারীর স্থান অনেক উপরে। আধুনিক জনজাতি সমাজে সাঁওতাল নারী-জাগরণ ভারতবাসীর কাছে এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

—সঞ্জয় ব্যানার্জি,
চুঁচুড়া,ব্যারাক রোড, হুগলী

মোদী সরকারের প্রতি শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতির কৃতজ্ঞতা

শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি বিক্রম রণসিঙ্ঘে এক সর্বদলীয় বৈঠকে বর্তমান আর্থিক সংকট নিরসনে ভারতের সাহায্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'দেশের আর্থিক সংকট কাটাতে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারতের ভূমিকার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। মোদী নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার আমাদের সঙ্কটকালে পাশে দাঁড়িয়ে শ্বাস ফেলতে সাহায্য করেছে। এই জন্য আমি মোদী সরকারসহ সমস্ত ভারতবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি'। এর আগে ভারত সরকার জানিয়েছে যে, শ্রীলঙ্কাবাসীদের জন্য গণতান্ত্রিক উপায়ে যে কোনও সাহায্যে প্রস্তুত।

বিক্রস রণসিঙ্ঘে ভারতের সঙ্গে যথেষ্ট ভালো সম্পর্ক রেখে চলেন। তিনি এই মন্তব্য করেন সেখানকার সংসদে চলা এক বিশেষ অধিবেশনে। সাতদিন শ্রীলঙ্কার সংসদ অধিবেশন মুলতুবি থাকার পর গত ৩ আগস্ট এই কথা তিনি বলেন। তিনি বিরোধী রাজনীতির উদ্দেশ্যে বলেন যে, ত্রিঙ্কুমালিতে যদি ভারতের সহায়তায় তেল ট্যাঙ্কের কমপ্লেক্স গড়া যেত, তবে আজ দেশবাসীদের তেলের জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হত না।

—তারক সাহা,
হিন্দমোটর, হুগলী

সরকারি কর্মচারীদের ডিএ-র বঞ্চনা

সরকারও মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ মানতে চায় না। ডিএ মামলা নিয়ে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কোর্টে কোর্টে ঘুরতে হয়। ডিএ মামলা প্রথমে স্যাটে শুরু হয়। স্যাটের বিচারক অমিত তালুকদার আদেশে বলেছিলেন 'ডিএ সরকারের দয়ার দান'। পরে স্যাটের বিচারক রঞ্জিত কুমার বাগ আদেশে বলেন 'ডিএ সরকারের দান নয়, মৌলিক অধিকার।' তারপর সেখান থেকে কলকাতা হাইকোর্ট-এ শুনানির পর মামলা ওঠে সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট থেকে হাইকোর্ট হয়ে আবার স্যাটে ফিরে আসে ডিএ সংক্রান্ত মামলা। স্যাট হয়ে হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। মে মাসে বিচারপতি হরিশ টন্ডন এবং বিচারপতি রবীন্দ্রনাথ সামন্তের ডিভিশন বেঞ্চের আদেশে বলা হয় ডিএ সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় অধিকার, চাকুরীর অন্যতম মৌলিক শর্ত। তিনমাসের মধ্যে সরকার ৩১ শতাংশ ডিএ সরকারি কর্মচারীদের দিতে বাধ্য থাকবে। এমন আদেশে সরকারি কর্মচারীরা আশায় বুক বাঁধে তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবার জন্য। সম কাজের জন্য সমবেতনের মৌলিক অধিকার বইকি। চেন্নাই এবং দিল্লির বঙ্গভবনে যে সমস্ত সরকারি কর্মচারী আছেন, তারা কেন্দ্রীয় হারে ৩১ সতাংশ ডিএ পান। আমাদের মতো তারাও এই বঙ্গের কর্মচারী। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশকে মান্যতা না দিয়ে নির্ধারিত সময়ের শেষলগ্নে ওই আদেশের পুনর্বিবেচনার জন্য সরকার হাইকোর্টে আবেদন জানায়। সময় নষ্ট করে সরকার সরকারী কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে তৎপর হয়। যা কখনই কাম্য নয়। অন্যদিকে সরকারি কর্মচারিদের পক্ষ থেকে আবেদনকারীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আদালত অবমাননার জন্য তারাও হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন। এখন রিভিউ পিটিশন ভার্সেস কনটেম্পট অব কোর্ট চলবে। জানি না সরকারি কর্মচারীদের মৌলিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আরও আরোও কত সময় লাগবে?

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে ভারতের মেয়েরা

সুতপা বসাক ভড়

ক্রীড়াজগতে মহিলাদের সাফল্যমণ্ডিত বিচরণ আমাদের উৎসাহিত করে। তবে, বেশ কিছু দুঃসাহসিক ক্রীড়ায় তাঁদের সাবলীল অংশগ্রহণ আমাদের আশ্চর্য করে তোলে। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে, শারীরিক ক্ষমতায় মহিলারা পুরুষদের তুলনায় সাধারণত একটু কম, অথচ কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতি— যেখানে মহিলাদের অংশগ্রহণ, তাঁদের শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তার সাক্ষর রেখে চলেছে।

ভক্তি শর্মা

অর্চনা সার্দানা : ছোটোবেলায় অর্চনা সার্দানা টিভির পর্দায় স্কাই ডাইভিং দেখে অবাক হয়ে যেতেন এবং ভাবতেন যে কী দুরন্ত উত্তেজনা আছে এই খেলাটিতে! বর্তমানে ৪৯ বর্ষীয়া এই বেস জাম্পার প্রথম ভারতীয় মহিলা, যিনি উঁচু সেতু, অট্টালিকা থেকে প্যারাশুটের সহায়তায় লাফ দিয়ে চলেছেন। একজন প্রতিষ্ঠিত স্কাই ডাইভার যিনি উঁচু স্থান থেকে কয়েক শো বার লাফ দিয়েছেন। এছাড়া, তিনি একজন স্কুল প্রশিক্ষকও বটে, যিনি নিজস্ব জল-ভীতি অতিক্রম করে এই ক্ষেত্রেও সফল হয়েছেন। একবার প্যারাশুট ঠিকমতো কার্যকরী না হওয়ার জন্য শারীরে আঘাত পান, কিন্তু পরের দিনই আবার ফিরে আসেন। ১৩,৫০০ ফুট উচ্চতা থেকেও 'ফ্রি-ফল' করেছেন, এই অদম্য সাহসী মহিলা।

প্রেমলতা আগরওয়াল

ভক্তি শর্মা : ভক্তি শর্মার কথায় মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি যখন 'ইংলিশ চ্যানেল' সাঁতার কেটে পার হয়েছিলেন, তখনই তাঁর লক্ষ্য ছিল তিনি পৃথিবীর প্রত্যেক মহাসাগরে সাঁতার কাটবেন। এজন্য তিনি কি না করেছেন! এর মধ্যে সব থেকে চ্যালেঞ্জিং কাজ ছিল অ্যান্টার্কটিকা এবং আর্কটিক মহাসাগরে সাঁতার কাটা। কনকনে শীতে উদয়পুরের জলাশয়ে সাঁতার কাটা থেকে শুরু করে ছোট্ট জলাশয়ে বেশি করে বরফ দিয়ে, সেই জলে ডুবে থাকতেন। ভক্তি বলেন, তিনি একঘেয়ে জীবনযাপন পছন্দ করেন না, আবার মাঝপথে হাল ছেড়ে দেবার পাত্রীও নন তিনি। সেজন্য পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক না কেন, তিনি চেষ্টা করতে থাকেন। বর্তমানে তিনি একজন ৩২ বছরের পিএইচডি ছাত্রী, যিনি ফ্লোরিডাতে গেইনেসভিলে আছেন।

তিনি জানিয়েছেন যে, উদয়পুর বা মুম্বাইতে সাঁতার কাটার সময়, অনেকেই তাঁর স্থূল শরীরের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। ভক্তি জানিয়েছেন যে খুব ঠাণ্ডা জলে সাঁতার কাটতে হয়, সেজন্য তাঁর শরীরের ওজন বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি বলেন যে, মহিলা ক্রীড়াবিদ্‌দের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গী এখনও যথেষ্ট ইতিবাচক নয়।

প্রেমলতা আগরওয়াল : প্রেমলতা ২০১৩ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। তবে পর্বতারোহণে তাঁর এই সফলতা কিন্তু কোনো নিয়ম মেনে হয়নি। এটি হয়েছিল আকস্মিকভাবে। মাউন্ট এভারেস্ট বিজয়িনী সব থেকে বয়স্কা ভারতীয় মহিলা জানিয়েছেন যে, তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর মেয়েরা যেন রোমাঞ্চকর ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই সময় বিখ্যাত পর্বতারোহী বাচেন্দ্রী পালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বাচেন্দ্রী পাল তাঁর মধ্যে সুপ্ত প্রতিভার সন্ধান পেয়েছিলেন এবং তিনি পর্বতারোহণের মতো রোমাঞ্চকর ক্রীড়ার জগতে আসার জন্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি বিশ্বের সর্বোচ্চ সপ্তশৃঙ্গ আরোহণ করেছেন। প্রেমলতা বলেন যে একজন গৃহিণী হয়েও তিনি পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত শৃঙ্গগুলি জয় করে, পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী, কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান ও আশাবাদী মানুষরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

প্রিয়াঙ্কা ভাট

প্রিয়াঙ্কা ভাট : ২০টি আল্ট্রা ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রিয়াঙ্কা ভাট তাঁর ব্যস্ত কর্মজীবনে হঠাৎ করে একদিন ২ কিলোমিটার দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন এবং দেখেন যে, মাত্র ১০০ মিটার দৌড়েই হাঁফিয়ে গেছেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৯ বছর, তা সত্ত্বেও তিনি অসফল হলেন। এরপর মনস্থির করেন যে ভালোভাবে দৌড়ানোর জন্য তিনি প্রতিদিন আধঘণ্টা দৌড় অভ্যাস করবেন। একমাস পরে ১০ কিলোমিটার রেসে দৌড়ান। এরপর তিনি 'হাফ-ম্যারাথনে'র জন্য প্রস্তুতি নেন। এরপর ১২ ঘণ্টা দৌড়ানো হয় তাঁর স্বপ্ন। ২০১১ সালে ২০ ঘণ্টা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। সেখানে ১৯০ কিলোমিটার দৌড়ান। তাঁর জীবনের এই পর্বে তিনি কোনো প্রতিষ্ঠানের বা কারও ব্যক্তিগত সাহায্য পাননি। তাঁর পরিবার বর্তমানে তাঁর সাফল্যে গর্বিত, কিন্তু পরিবারের সদস্যরা প্রশ্ন করেন যে, আর কত দৌড়াবে তুমি? কী হবে এত দৌড়ে? তিনি শুধু তাঁর লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন।

অর্চনা সার্দানা

ভারতীয় মহিলাদের এই সাফল্যগাথা আমাদের উদ্বুদ্ধ করে এবং আমরাও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জীবনের পথে চলার পাথেয় খুঁজে পাই। □

টেক নেক সমস্যা নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

টেক নেক কথাটি চিকিৎসাবিজ্ঞানে নতুন, তবে এর উপসর্গের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। সাধারণ বাংলায় যাকে বলে ঘাড়ে ব্যথা, তারই পোশাকি নাম টেক নেক। অনেকক্ষণ ধরে কম্পিউটারে কাজ করতে করতে, মোবাইলে ভিডিয়ো দেখার সময়, কিংবা ল্যাপটপে ঘাড় গুঁজে অ্যাসাইনমেন্ট করতে গিয়ে অনেকেরই অল্প থেকে প্রবল ঘাড়ে ব্যথা অনুভূত হয়।

এই সমস্যাকে সামান্য সমস্যা বলে অবহেলা করলে তা তীব্র আকার ধারণ করে। একেই বলে টেক নেক, আর বাংলায় ঘাড় ব্যথা। করোনা ভাইরাস অতিমারির কারণে অনেকেই আমরা বাড়ি থেকে কাজ করছি। আর বাকি সময়টা গ্যাজেটে কিছু না কিছু দেখে কাটাচ্ছি। ফলে অন্য সময়ের তুলনায় এই সময়ে আমাদের ডিভাইসের ব্যবহার বেশি করে হচ্ছে। ফলত বৃদ্ধি পাচ্ছে ঘাড়ের ব্যথা।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'আমরা যখন কম্পিউটার, মোবাইল বা ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে থাকি তখন আমাদের কাঁধ ও চোয়াল ডিজিট্যাল স্ক্রিনের সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে। ঘাড়ও সেজন্য দীর্ঘ সময়ের জন্য বাঁকা হয়ে যায়। ফলে দেহভঙ্গিতে অবধারিতভাবে পরিবর্তন আসে।'

টেক নেকের কিছু সাধারণ উপসর্গ

- ঘাড় ও পিঠের উপরের অংশে ব্যথা ও অনুভূতিহীনতা।
- মাথায় ব্যথা কাঁধে ব্যথা হয়ে ক্রমশ তা পিঠের দিকে নামা।
- পেশিতে খিঁচ লাগা অনুভূত হওয়া।

কীভাবে এই সমস্যার প্রতিরোধ করবেন?

স্পোর্টস বিশেষজ্ঞদের মতে, যেহেতু আমাদের ঘাড়ে বা কাঁধে ব্যথা হঠাৎ করে শুরু হয় না, কাজেই যতক্ষণ না ব্যথা শুরু হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের বসার বা কাজের ভঙ্গি নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনও হেলদোল দেখা যায় না।

বিশেষজ্ঞরা একটি বিষয়ের উপর বারে বারেই জোর দিচ্ছেন আর তা হলো ডিজিটাল ডিভাইসে কাজ করার সময়ে সঠিক ভঙ্গিতে বসে গ্যাজেট ও ঘাড় ঠিকমতো রাখার ব্যাপারটিকে নিশ্চিত করতে হবে। সেজন্য উপযুক্ত চেয়ার ও টেবিল যেমন রাখতে হবে, তেমনি বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় এগুলি ব্যবহার করলে ব্যথা বাড়বে বই কমবে না।

বিশেষ কয়েকটা পদক্ষেপ

টেক নেকের সমস্যার সমাধান করতে গেলে বিশেষ কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে—

১. কর্মস্থলে বসার জায়গা বদলান : আপনি কোথায় কীভাবে বসে মানে কোন দেহভঙ্গিমায় বসে সারাদিন কাজ করছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে এখন কোভিডের জন্য অনেকেই বাড়িতে কাজ করার ফলে বিছানা, সোফা কিংবা ডাইনিং টেবিলে বসে কাজ করছেন। শুয়ে বা হেলান দিয়ে কাজ করা থেকে বিরত থাকুন। কেন না এর থেকে ঘাড়-পিঠে ব্যথা হয়। বাড়িতে কাজ করার সময়ে প্রয়োজনীয় কম্পিউটার টেবিল ব্যবহার করুন এবং কম্পিউটার বা ল্যাপটপের স্ক্রিন যাতে চোখের থেকে সামান্য নীচে থাকে সেভাবে সেট করে নিন।

২. দেহভঙ্গিমা সঠিক রাখুন : টেন নেক জাতীয় সমস্যার পিছনে মূলত আমাদের অঙ্গবিন্যাস দায়ী। কুপারের মতে, অধিকাংশ মানুষই সামনের দিকে ঝুঁকে কি-বোর্ডে টাইপ করে। এটি অত্যন্ত ক্ষতিকর। কাজের সময়ে শিরদাঁড়া যাতে টানটান থাকে খেয়াল রাখুন। সোজা হয়ে বসুন।

৩. কাজের ফাঁকে বিরতি : এটাও ভীষণ দরকার। স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, কম্পিউটার— যে ধরনের ডিজিটাল ডিভাইসে আপনি কাজ করুন না কেন একঘণ্টা কাজের পরে ৩ মিনিটের বিরতি নিন। উঠে হেঁটে আসুন, চোখে জল দিন, ঘাড়ের ব্যায়াম করুন। খুব বেশি সময় ধরে স্মার্টফোন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে ব্যবহার করুন হোল্ডার।

৪. শরীর করুন টানটান : কাজের সময়ে বা ডিজিটাল স্ক্রিনে কিছু দেখার সময়ে যেহেতু আমাদের পেশি অনেকক্ষণ ধরে একই ভঙ্গিতে থাকে, তাই মাঝে মাঝে স্ট্রেচ করা বা শরীর টানটান করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে চেয়ারের শেষপ্রান্তে সোজা হয়ে বসে হাত ওপরে রেখে পিছন দিকে বাঁকিয়ে বডি স্ট্রেচ করতে পারেন। এ সময়ে ডিপ ব্রিদিং করুন এবং একটানা ৩০ সেকেন্ড এই ভঙ্গি ধরে থাকুন। তাহলে কাটবে পেশির জড়তা।

মণীশ সিসোদিয়ার পাঁচশো কোটির আবগারি কেলেংকারি

সুমন চন্দ্র দাস

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, 'আমাদের সবাইকে একবারে গ্রেপ্তার করুন। আমাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চালান, তল্লাশি চালান, কারণ আমরা এত রাজনীতি বুঝি না। আমরা কেবলই কাজ করতে চাই।' —এখন কথা হলো এই কথাগুলি কেন বললেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। হ্যাঁ দিল্লিতে ২০১৫ সালের পর থেকে যেভাবে সংবিধান বিরোধী আর্থিক নিয়ম এবং বিনামূল্যে দান খয়রাতির রাজনীতি হয়েছে তার মধ্যে বর্তমান উপমুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্য মন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া নিজের প্রভাব খাটিয়ে যে ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতি করেছেন যার তদন্ত শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। এই অসাংবিধানিক আর্থিক দুর্নীতির প্রকৃত সুবিধা ভোগ করেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল স্বয়ং। কয়েকমাস আগেই দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের বাড়িতে ইডি তদন্ত করে পাঁচ কোটি টাকা হাওলা কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার তথ্য উদ্ধার করেছে। সেইসঙ্গে প্রচুর টাকা ও সোনা উদ্ধার করে ইডি। পঞ্জাবের আপ সরকারের মন্ত্রী বিজয় সিংলাকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ঘুষ কাণ্ডে গ্রেপ্তার করেছে। উদ্‌বৃত্ত সম্পত্তি এবং মালিকানাধীন সম্পত্তির হিসেব না দিতে পারায় গ্রেপ্তার হয়েছেন আপের নেতা সত্যেন্দ্র জৈন। কিন্তু এই অভিযুক্ত মন্ত্রীকে এখনও পর্যন্ত দিল্লি কেজরিওয়াল সরকার আর্থিক মামলার কারণে তাকে মন্ত্রিত্ব থেকে মুক্ত করতে পারেননি। কেজরিওয়াল বিপদ বুঝতে পেরে মণীশ সিসোদিয়ার জন্য আগাম জামিনের জন্য একপ্রকার সাংবাদিক সম্মেলন করলেন। আপ প্রধান আর্থিক দুর্নীতি থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে আর্থিক দুর্নীতি বিষয়ে বিভ্রান্ত তৈরি করছেন।

দিল্লিতে কংগ্রেসকে পরাজিত করে কেজরির আপ সরকার ২০১৫ সালে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় বসে প্রতিনিয়ত সত্যের অপলাপ করে চলেছে। কংগ্রেস সরকারের শীলা দীক্ষিত দিল্লি বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থাকে ৩০০ কোটি টাকা ঋণ মুকুব করেছিলেন কিন্তু আপ সরকার ক্ষমতায় এসে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা কর মকুব করে। এই কর মকুবের টাকা কোথা থেকে সরকার দেয়? কার্যত জনগণের করের টাকাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে কালবাজারি মাফিয়াদের সুবিধা দিয়েছেন। নতুন ৫০০টি স্কুল করার কথা বলেছেন আপ সরকার, সেখানে ১৬টি স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, ৭০১ স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই, প্রায় ৭৫০ স্কুলে বিজ্ঞান ও অঙ্ক

পুলিশ হেফাজতে সতেন্দ্র জৈন।

পড়ানোর শিক্ষক নেই। প্রায় ১৬৮৩৪ শিক্ষকের পদ শূন্য। আপ সরকার নিজস্ব চাকরির পোর্টালে প্রায় ১৫ লক্ষ ১৩ হাজার বেকার নথিভুক্ত করে রেখেছে। ২০১৫ সালের পর থেকে দিল্লি সরকার মাত্র ৮৪৯ জনকে নিযুক্ত করেছে অথচ মুখে বলছে ৩২৪৬ জন চাকরি পেয়েছে। সবটাই বিজ্ঞাপন দিয়ে সরকারের গুণকীর্তন করা হচ্ছে। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং অসত্যের কর্মকাণ্ড চালিয়েও প্রেস বার্তায় গলাবাজি চলছে। ১০০০ মহল্লা হাসপাতাল করার কথা বলেছিল আপ সরকার। হাইকোর্ট নিজে মন্তব্য করে যে এই মহল্লার হাসপাতাল করোনার বিপর্যয়ের সময় কোনো কাজে লাগেনি। মহল্লা হাসপাতালের পরিকাঠামো অত্যন্ত রুগ্ন। স্বাস্থ্য মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের সঙ্গে আর্থিক কারচুপি করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে লাভবান হন বলে বিশেষ অভিযোগ রয়েছে উপমুখ্য মন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার উপর।

মণীশ সিসোদিয়া যে আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত তার মধ্যে প্রধান হলো দিল্লি সরকারের নতুন এক্সাইস পলিসি। এই পলিসির মধ্যে প্রধান যে বিষয় তা হলো কোনো মদের দোকানের কোনো বিশেষ পরিকল্পনা ছিল না। নিয়ম অনুযায়ী একই ব্যক্তি একের অধিক লাভজনক টেন্ডারে থাকতে পারবেন না। কিন্তু মদের লাইসেন্স, বিক্রি এবং দোকানের কোনো বিষয় মাস্টার প্ল্যানে ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই এক্সাসাইস পলিসিতে সরকারি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন কোম্পানি বা ব্যক্তিকে ঠিকাদারি দেওয়ার নিয়ম নেই। কিন্তু উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া নিজে এই বিশেষ মাস্টার প্ল্যানের মধ্যে নিজের আর্থিক সুবিধার জন্য পঞ্জাবের কিছু লিকার মাফিয়া বা সংস্থাকে এই রকম আর্থিক সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন। প্রায় ৮৪৯টি মদের দোকানের টেন্ডার নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অনুমেয় যে এই সুবিধাকে টোপ হিসেবে কেজরিওয়াল পঞ্জাবের নির্বাচনে ব্যাপক ব্যবহার করেছেন। পঞ্জাবের মদ বিক্রেতা কাছের মানুষদের ওই সুবিধা পাইয়ে দেন বলে বিশেষ অভিযোগ রয়েছে। পরিকল্পনায় কোনো প্রকার কার্টেল টেন্ডারের কোনো অনুমতি ছিল না। কিন্তু উপমুখ্যমন্ত্রী প্রাথমিক ভাবে নিজের অনুমোদন দেন, পরে আইনের নিয়মে বেগতিক দেখে দিল্লি বিধানসভায় পাশ করান। একই ভাবে এই সংক্রান্ত বিষয়ে নানা বেআইনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মণীশ সিসোদিয়া। ফলে এতে মণীশ সিসোদিয়া প্রচুর অবৈধ আর্থিক সুবিধা লাভ করেন বলে অভিযোগ থাকার অনুমান অগ্রাহ্য করা যায় না। ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে এক্সাইস বিভাগের কমিশনার বিশেষ নোটিস দিয়ে জানতে চেয়েছেন এই ঠিকাদারি বা টেন্ডারের ক্ষেত্রে মাস্টার প্ল্যানে যা বলা নেই অথচ কেন তা করা হয়েছে তার কারণ দর্শাতে বলা হয়। তার বিরুদ্ধে কেন তদন্ত হওয়া উচিত তা আরেকবার স্পষ্ট হয়। গত বছর নভেম্বরের নোটিসের কেন প্রসঙ্গ তুলছেন সেই কথা কেজরিওয়াল ও মণীশ সিসোদিয়া এখনও উল্লেখ করেননি। শুধু গ্রেপ্তার হতে পারেন বলে আগাম বক্তব্য রেখে বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করছেন।

করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউয়ে দিল্লিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের সেবার্থে খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা না করে, করোনার টিকার ব্যবস্থা না করে দিল্লি থেকে বাইরে বের হয়ে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়েছিলেন কেজরিওয়াল। এই করোনার সময় প্রায় ১৪৪ কোটি টাকার আর্থিক কর হিসেবে মদের দোকানদারদের করমুক্ত করে সুবিধা দিয়েছেন। কারণ দিল্লিতে ফ্রি জল, ফ্রি বিদ্যুৎ সংগ্রহের জন্য মদ বিক্রির উপর বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করে দেন। প্রথমে দিল্লিতে মদের দোকান থেকে বার্ষিক আয় হতো প্রায় ৬০০ কোটি টাকা, বর্তমানে কেজরিওয়াল সরকার আয় করেছে ৯৫০০ কোটি টাকা। মদের প্রচার প্রসার করে সরকারের আয় বৃদ্ধি কতটা ভালো, সময় বলবে। আপ প্রধান নিজে প্রকাশ্য সভায় বলেছিলেন ২০১৯ লোকসভার নির্বাচনে যে 'দাওয়া দারুকা ইনতেজাম কর দিয়া হ্যায়' পরে জিভ কেটে বলেন 'দাওয়া কেবল, দারু নেহি'। কার্যত সরকারের মদ বিক্রি এবং করের টাকা অর্জনের প্রতি যে বিশেষ লোভ তা বিশেষ নজরকে উপেক্ষা করতে পারে না। এই কর আদায়ের আসল নায়ক মণীশ সিসোদিয়া। দিল্লির উপরাজ্যপাল এই নিয়ে বারবার কেজরিওয়াল সরকার এবং মন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াকে যেমন সতর্ক করেছেন তেমনি সমালোচনাও করেছেন। আর সেই দায় অন্যের ঘাড়ে চাপাতে মণীশ সিসোদিয়া উপরাজ্যপালকে টার্গেট করেছেন। এই উদ্দেশ্য অত্যন্ত কূট। সারা দেশেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই, ইডি দুর্নীতির উপর তদন্ত করছে। দিল্লিতে ন্যাশনাল হেরল্ড মামলায় আর্থিক দুর্নীতিতে হেরল্ড ভবন বাজেয়াপ্ত

করেছে ইডি। কংগ্রেসের হাই কমান্ড সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী ইডির দপ্তরে হাজিরা দিচ্ছেন। তদন্তে সহযোগিতা না করে দিল্লির তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে প্রতিবাদ প্রদর্শন করে কেন্দ্রীয় সংস্থার গরিমা নষ্ট করছে কংগ্রেস।

বিরোধী নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীর মতে ইডি পশ্চিমবঙ্গে ঠিক করছে কিন্তু দিল্লিতে রাজনীতির শিকার করছে কংগ্রেস। এই দ্বিমুখী নীতি কংগ্রেসে দলের। মহারাষ্ট্রে শিবসেনার নেতা সঞ্জয় রাউত আর্থিক দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। তার স্ত্রী বর্ষা রাউতকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পশ্চিমবঙ্গে এসএসসি আর্থিক দুর্নীতি মামলায় বর্তমান শিল্পমন্ত্রী এবং প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। প্রায় নগদ পঞ্চাশ কোটি টাকা-সহ সোনা উদ্ধার হয়েছে। তৃণমূলের ১৯ জন নেতা-মন্ত্রীর আর্থিক লেন-দেন বৃদ্ধির উপর হাইকোর্ট ইডিকে পার্টি করার নির্দেশ দিয়েছে। মণীশ সিসোদিয়াও আইনের ঊর্ধ্বে নন। কাজেই কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার প্রতি নিরপেক্ষ আস্থা রেখে তদন্তে সহযোগিতা করাই প্রত্যেক ভারতীয়র কাজ। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দিল্লি থেকে পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, পশ্চিম-বঙ্গের সর্বত্র নিজের কাজ করে চলেছে। অভিযুক্ত মানেই দোষী এমন নয়, তবে দোষ প্রমাণিত হলে অপরাধী শাস্তি অবশ্যই পাবে, এটাই ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার উজ্জ্বল দিক। ■

দুর্নীতি যে পথে

মণীশ সিসোদিয়া : ২০২১-এ নয়া মাদক নীতিতে মদের ঢালাও লাইসেন্স দিতে শুরু করে দিল্লির আপ সরকার। দিল্লিতে এতদিন প্রচলিত নিয়ম ভেঙে মাদক সংক্রান্ত নতুন বিল আনে কেজরিওয়াল সরকার। ফলে দিল্লির মাদক ব্যবসায়ীদের দাপট বৃদ্ধি পায়, বাড়ে কালোবাজারি। আগে দিল্লিতে মাদক বিক্রির লাইসেন্স পেতে দিতে হতো ৪ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। আপ সরকার সেই লাইসেন্স ফি ধার্য করল ৫ কোটি টাকা। ফলে ছোটো ব্যবসায়ীদের পেটে লাথি মেরে মাদক ক্ষেত্রে লিকুয়্যার মাফিয়াদের বাড়বাড়ন্ত শুরু হলো। বাড়লো কালোবাজারি। একটা সময় দিল্লিতে মাদক বিক্রির লাইসেন্সের জন্য প্রয়োজন হতো লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অনুমতি। কেজরিওয়াল সরকার সেই বাধ্যবাধকতার সরলীকরণ ঘটালো। লাইসেন্স পেতে কড়াকড়ি রইল না। শুধু তাই নয়, নতুন মাদক নীতিতে আবগারি শুল্ক ২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে একলাফে ১২ শতাংশ করা হয়েছে। অভিযোগ ১২ শতাংশের মধ্যে দিল্লির সরকার মাত্র ২ শতাংশই পেত। পাঁচ শতাংশ বরাদ্দ ছিল দলীয়ভাবে আপ-এর জন্য। বাকী ৫ শতাংশ মাদক মাফিয়াদের কাছে যেত।

এই সংক্রান্ত মামলায় আর্থিক তছরুপের অভিযোগ উঠেছে দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে। অভিযোগ নতুন আবগারি নীতিতে বৃহৎ অঙ্কের দুর্নীতি করেছেন মণীশ।

আমানাতুল্লা খান : আম আদমি পার্টির ওখলা বিধানসভার বিধায়ক আমানাতুল্লা খান, দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে ওয়াকফ কর্ম সমিতির নিয়োগ এবং ওয়াকফ সম্পত্তির নয়ছয়ের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, চেয়ারম্যান থাকাকালীন আমানাতুল্লা ওয়াকফ কমিটিতে আত্মীয়-স্বজনকে বেআইনিভাবে নিয়োগ করেন। তার বিরুদ্ধে ওয়াকফ সম্পত্তি ও আর্থিক তছরুপের অভিযোগ ওঠে। শুধু তাই নয়, কেজরিওয়াল সরকারের মহল্লা ক্লিনিক প্রকল্পের জন্য আত্মীয় পরিজনদের বাড়ি দেখিয়ে ভাড়া বাবদ সরকারি টাকা তছরুপেও অভিযুক্ত হন ওখলার বিধায়ক। আপ সরকারের প্রথম মেয়াদেও ব্যাপক দুর্নীতি, বেআইনি কাজ ও ঘুষের অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। পরবর্তীকালে ওয়াকফ বোর্ড থেকে অপসারিত হন। আমানতুল্লাকে হেফাজতে নেয় সিবিআই।

সত্যেন্দ্র জৈন : আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনকে গ্রেপ্তার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। অভিযোগ, ২০১৫-১৬ সালে কলকাতার একটি সংস্থার সঙ্গে হাওয়ালা লেনদেনে যুক্ত ছিলেন তিনি। ৪.৮১ কোটি টাকা বেআইনি লেনদেনের হদিশ পাওয়া গেছে। অভিযোগ, ওই টাকা সরাসরি জমি কেনার জন্য বা দিল্লি এবং তার আশেপাশে কৃষি জমি কেনার জন্য ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। ইডির দাবি সত্যেন্দ্রর আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন বিপুল পরিমাণ টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে কলকাতায় একাধিক ভুয়ো সংস্থার অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছিল। সত্যেন্দ্রই সেই সংস্থাগুলির নেপথ্যে নিয়ন্ত্রক।

দুর্নীতিতে বামেরাও ধোয়া তুলসীপাতা নয়

ভবানীশঙ্কর বাগচী

সাম্প্রতিককালের শাসকদলের পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির খবরে তোলপাড় হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের জনজীবন। ইডি হাত দিলেই দেখা যাচ্ছে টাকার পাহাড়। আজ গোরু পাচার, তো কাল চিটফান্ড। পরশু শিক্ষক নিয়োগ তো তারপর কয়লা কেলেঙ্কারি। একের পর এক দুর্নীতির আঁতুড়ঘর হয়ে উঠেছে এ রাজ্য। দিনকয়েক আগে দূরপাল্লার ট্রেনে সফর করছিলাম। কামরায় আলাপ হলো ছত্তিশগড় নিবাসী এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে। কথায় কথায় মহারাষ্ট্রের জালনায় আয়কর দপ্তরের হানায় ৫৮ কোটি টাকা নগদ উদ্ধারের প্রসঙ্গ উঠলো। প্রৌঢ় জানালেন, তার আগে তো পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জির ফ্ল্যাটে প্রায় ৫০ কোটি উদ্ধার হয়েছে। বুঝলেন না, 'হোয়াট বেঙ্গল থট ইয়েসটারডে, ইন্ডিয়া থিংকস টুডে' বিকৃত প্রবাদটা বলেই হেসে উঠলেন। আমি বাঙ্গালি হিসেবে চুপ মেরে রইলাম।

এই দুর্নীতির ঘুঘুর বাসা তৈরি হয়েছে অনেক আগেই। সেই বাম জমানায়। ২০১১-তে সেই ঘুঘুর বাসা একটু মডিফাই হয়েছে মাত্র। তৃণমূল কংগ্রেসের শিকড় গজিয়েছে ১৯৯৮ সালে। মাত্র ১৩ বছরের অধ্যবসায়েই ২০১১-তে রাজ্যের ক্ষমতা হস্তগত হওয়ার পর অপ্রত্যাশিতভাবে যখন সরকার তৈরি করল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল, সেই চাপ সম্ভবত সামলে উঠতে পারেনি ঘাসফুল শিবির। যেসব মার্কামারা সহকর্মী ছিল তাদের দিয়ে তৃণমূল যে সরকারের পাঁচটা বছর পূরণ করবে খোদ নেত্রীই কি তা ভাবতে পেরেছিলেন? তাই প্রথম পাঁচটা বছর ছিল তাদের কাছে লুটেপুটে খাওয়ার গোল্ডেন পিরিয়ড। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। খাওয়ার পর মুখ মুছে ফেলতে পারেনি। কখনও মদন, কখনও কুণাল, কখনও টুম্পাই-সহ আরও অনেক ছোটো-বড়ো, কেউকেটা জেলের ভাত খেয়েছে। আজ বীরভূমের মুখ্যমন্ত্রী অনুব্রত এবং দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড পার্থও গরাদের পিছনে।

বিধায়ক-সাংসদদের লম্বা তালিকা নাকি রয়েছে ইডি, সিবিআইয়ের হাতে। কাজেই কার ডাক কখন আসবে তা দেবা না জানন্তি।

সেই অর্থে তৃণমূল দলটা শৃঙ্খলাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত --- কোনওটাই নয়। সেক্ষেত্রে বামেদের ৩৪ বছরের শাসন দেখিয়ে দিয়েছে দলটা রেজিমেন্টেড। তাদের আমলে দু' টাকার দুর্নীতিও হয়েছে খুব সন্তর্পণে। আটঘাট বেঁধে। দীর্ঘ চৌত্রিশ বছরের বাম আমল এবং তারপর থেকে আজ ইস্তক প্রচুর রাঘববোয়াল নেতা মন্ত্রীর নাম জড়িয়েছে নানা দুর্নীতিতে। কিন্তু প্রমাণের অভাবে বোয়ালগুলো জাল কেটে বেরিয়ে গেছে।

সারদা চিটফান্ড কেলেঙ্কারির কথাই ধরা যাক। প্রায় ২০০০ কোটি টাকার এই চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে কার নাম জড়ায়নি? কুণাল ঘোষ যেদিন গ্রেপ্তার হবেন, তার আগের দিনই তিনি নিউজ চ্যানেলের পর্দায় ভিডিয়ো রেকর্ডিং মারফত সবকিছু খোলসা করে দিয়েছিলেন। তাঁর দাবি ছিল তিনি যদি গ্রেপ্তার হন, একই দোষে দুষ্ট বাকিরাও ধোয়া তুলসীপাতা নন। তাদেরও জেলবন্দি করা হোক। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও জড়িয়েছে এই কেলেঙ্কারিতে। তাঁর আঁকা 'অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট' (?) সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন কিনেছিলেন ২ কোটি টাকায়। সুদীপ্ত শিল্পের সমঝদার বটে! না হলে ভূ-ভারতে এত বিখ্যাত চিত্রশিল্পী থাকতে তার চোখ আটকে গেল 'দিদির' আঁকা ছবিটিতে। মদন মিত্র গ্রেপ্তার হলো সারদা মামলার অন্যতম ষড়যন্ত্রী হিসেবে। সুদীপ্ত তার চিটিংবাজি কারবারের সাম্রাজ্য চালাতে অনেক নেতা-মন্ত্রী এমনকী বিরোধী নেতাদেরও মাসোহারা দিয়ে পুষতেন বলে শোনা গেছে। রাজনৈতিক মহলের দাবি, তৎকালীন বিরোধী নেতাদের মধ্যে সিপিএমের গৌতম দেব, সুজন চক্রবর্তী এবং কংগ্রেসের অধীর চৌধুরির নামও আছে। এই সুজন চক্রবর্তীই আবার তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের গ্রেপ্তারির জন্য সুনন্দ সান্যাল, অসীম চ্যাটার্জি, সুখবিলাস বর্মাদের নিয়ে বিধাননগর গিয়েছিলেন।

২০১৫-তে বিধানসভা অধিবেশনে তৃণমূল সরকারকে পর্যুদস্ত করতে যখন বিরোধীরা কোমর বাঁধছে, তখনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙার কথা' বলেছিলেন। তিনি জানান, সারদার গোড়াপত্তন বাম আমলে, সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর হাত ধরে। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের বিরোধিতা সেদিন বামেরা করেনি। সুজন একটু গুটিয়ে গিয়েছিলেন মাত্র। কান্তি গাঙ্গুলী বলেছিলেন, 'আমি চাই, সুজন এই

অভিযোগের যোগ্য জবাব দিক। আরও তদন্ত হোক। সত্যিটা উঠে আসুক।' সেই সত্যের উপর থেকে পর্দা সরাতে সিপিএমের প্রাক্তন নেতা-মন্ত্রী গৌতম দেবের সঙ্গে সুজন চক্রবর্তীকেও তলব করেছিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। বার দুয়েক জিজ্ঞাসাবাদ হয়েছে। মামলাটি বিচারাধীন।

সারদা মামলার ট্রায়াল চলাকালীন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষের আইনজীবী বলেছিলেন, 'এ লার্জার কন্সপিরেসি হ্যাজ বিন কন্সপায়ার্ড'— এই লার্জার কন্সপিরেসি বা বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের শরিক তৃণমূলের সঙ্গে তৎকালীন বিরোধীরাও একই সঙ্গে ডুবে ডুবে জল খেয়েছেন। প্রকাশ্যে তারা কাদা ছোঁড়াছুড়ি করেন, আদতে সবাই চোরে চোরে মাসতুতো সেয়ানা। ও বলে আমায় দ্যাখ, এ বলে আমায় দ্যাখ। আর এসবের যাঁতাকলে পড়ে, লক্ষ লক্ষ আমানতকারীরা ভুয়ো অর্থলগ্নি সংস্থায় প্রতারিত হয়ে যখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, তাদের প্রিয় 'দিদি' বলেন, 'যা গেছে তা গেছে।'

লোকে বলে, সুদীপ্ত সেনের ভুয়ো অর্থলগ্নি সংস্থা সারদার জন্ম বারুইপুরে। বাম নেতা সুজন চক্রবর্তীর তালুকের অনতিদূরে ফুলতলায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই নেতার শ্বশুরমশাই শান্তিময় ভট্টাচার্য এক সময় ওই জেলার সম্পাদক ছিলেন। স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদও সামলেছেন। অভিযোগ, তৃণমূল ক্ষমতায় আসার আগে

সুজনের আশকারাতেই সারদার বারবাড়ন্ত শুরু হয়। একসময় সুজন চক্রবর্তীর এক ঘনিষ্ঠ আমায় বলেছিলেন, ২০০৪ লোকসভা নির্বাচনে সুজনের ভোটে দাঁড়ানোর পুরো খরচটাই বহন করেছিলেন সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন। সিপিএমের ভরা জোয়ারে গা ভাসিয়ে সুদীপ্ত তখন রিয়েল এস্টেট বিজনেসে পসার জমিয়ে ফেলেছেন। এলাকার মানুষ বলেন, সারদা কর্তা সুদীপ্তের সঙ্গে সুজনের যোগাযোগের মিডিয়াম ছিল ফুলতলার বুম্বা। তার মাধ্যমেই দু' পক্ষের যাবতীয় লেনদেন, বার্তা আদান-প্রদান হতো।

২০২০ সালে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে সিসি করে প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি লেখেন সুদীপ্ত। জেল থেকে লেখা সেই চিঠিতে তিনি দাবি করেন, অধীর রঞ্জন চৌধুরিকে ৬ কোটি, বিমান বসুকে ২ কোটি এবং সুজন চক্রবর্তীকে ৯ কোটি টাকা দিয়েছেন বিভিন্ন সময়ে। বলাই বাহুল্য, এগুলো মসৃণ ভাবে ব্যবসা চালানোর উৎকোচ মাত্র। ২০১৩ সালের মাঝামাঝি মুখ থুবড়ে পড়ে সারদা অর্থলগ্নি সংস্থা। ২০১২ সালের শেষদিকে বারুইপুরের আমার পরিচিত এক সংবাদপত্র বিক্রেতা খবর দেন সারদার আমানতকারীদের ম্যাচিওরিটি চেক বাউন্স করছে। এমন তিনজনের নাম ও ফোন নম্বর দিয়েছিলেন আমায়। তার কয়েক মাসের মধ্যে আমানতকারীদের কষ্টার্জিত টাকায় রাঘব বোয়ালদের ফুর্তি করার ইতিবৃত্ত দেখানো হয় প্রত্যেকটি নিউজ চ্যানেলে। এই মামলায় পরবর্তীকালে সিবিআই তলব করে সুজন চক্রবর্তী ঘনিষ্ঠ বুম্বাকে। ঘটনাচক্রে বারুইপুরে যেখানে সারদার প্রথম অফিসটি খোলা হয়, সেই ফুলতলা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে বুম্বার বাড়ি। এক দুর্গাপুজোর সকালে স্থানীয় পুজোর প্যান্ডেলে বুম্বা বসে আড্ডা মারছে। এমন সময় তার মোবাইলে খবর এল, সিবিআই আসছে। এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বুম্বা। সেদিন বুম্বার নাগাল পায়নি সিবিআই। মাস তিনেক পরে অবশ্য তাকে হেফাজতে নেয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। আপাতত বুম্বা মুক্ত। সহজেই অনুমেয় সেদিন সিবিআইয়ের আসার আগাম বার্তাটি কার কাছ থেকে পেয়েছিল বুম্বা।

ইদানীং বহু চ্যানেলেই বাইট দিতে দেখি সুজনবাবুকে। শিক্ষিত, ভদ্র। মাপা কথা, চাপা কাজ। সব কিছুতেই বেশ গোপনীয়তা। চারপাশ বাঁধা। বামে কী হচ্ছে, ডানদিকও জানতে পারবে না। অনেকটা ধোওয়া তুলসীপাতার মতো। মদন, অধীর, সুজন, মমতা— এঁরা সবাই সবারটা খুব ভালোমতো জানেন। যা কিছু বাকবিতণ্ডা, সব অন ক্যামেরায়। মিলেমিশে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ। এই সেয়ানে সেয়ানে মিল আছে বলেই এ রাজ্যে দুর্নীতি দীর্ঘজীবী। ২০১৬ সালে ওড়িশার ঝাড়সুগুডা এয়ারপোর্টে বসে এ রাজ্যের এক কয়লাব্যবসায়ী বলেছিলেন, বিজনেসকে লিয়ে দোনো পার্টি কো খিলানা পড়তা হ্যায়। গভর্নমেন্ট কো ভি আউর অপোজিশন কো ভি। তভি কাম বানতা হ্যায়। সুজনবাবুরা সুবোধ বালকের মতো যতই মুখ ধুয়ে স্টুডিয়োতে ন্যায়ের পরাকাষ্ঠা সেজে বসে থাকুন, ডাক কিন্তু আসবেই। এ ডাক অনন্তের নয়। সিবিআই ইডির ডাক। ▯

ফঃ ৪

স্বাধীনতা ৭৫ উদ্‌যাপন সমিতি, দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে কলকাতায় প্রবুদ্ধ সম্মেলন

স্বাধীনতা ৭৫ উদ্‌যাপন সমিতি, দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে গত ৭ আগস্ট কলকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ‘ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গলার গরিমাময় নেতৃত্বের প্রেক্ষিতে বর্তমান প্রবুদ্ধ সমাজের আশু ভূমিকা’ শীর্ষক এক প্রবুদ্ধ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন স্বাধীনতা ৭৫ উদ্‌যাপন সমিতির সভানেত্রী প্রখ্যাত নেতাজী গবেষক ও মুখার্জি কমিশনের অন্যতম সদস্যা ড. পূরবী রায়, বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের প্রপৌত্র বিশ্বরঞ্জন দাশ এবং কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিশিষ্ট আইনজীবী অজয় নন্দী। প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও লেখক, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বতন সহ সরকার্যবাহ সুরেশ সোনি। ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান ও বন্দে মাতরম্ রাষ্ট্রগীতের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। প্রতিবেদন পাঠ ও প্রাস্তাবিক বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুব্রত ভৌমিক। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে বিগত এক বছরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কার্যক্রমের উল্লেখ করেন। সভানেত্রীর বক্তব্যে শ্রীমতী রায় দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণবলিদানকারী বিপ্লবীদের উল্লেখের পাশাপাশি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর দেশের জন্য আত্মত্যাগের উল্লেখ করে বলেন, যারা নেতাজীকে ভয় করতেন, তারাই তাঁর মৃত্যুর কথা বেশি প্রচার করেন। তিনি উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে অনুরোধ করেন, তাঁরা যেন কারও দ্বারা সামান্যতম প্রভাবিত হয়েও তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর কথা বিশ্বাস না করেন। প্রধান বক্তা শ্রীসোনি নবজাগরণে বাঙ্গলার মনীষীদের উল্লেখ করে বলেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীরা তাঁদের কাছেই প্রেরণা পেয়েছিলেন। চলমান কালখণ্ডে পশ্চিমবঙ্গকে দেশ তথা বিশ্বের সামনে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করার দায়িত্ব বর্তমানের প্রবুদ্ধজনদেরই নিতে হবে।

সম্মেলনে বিবেকানন্দ সভাকক্ষটি পরিপূর্ণ হওয়ায় বহু শ্রোতাকে নীচের কক্ষে বসতে হয়। কেশব ভবনেও সরাসরি সম্প্রচার করে বক্তব্য শোনানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রবীর মুখার্জি এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিশ্বরঞ্জন দাস। পরিশেষে ‘জনগণমন’ গেয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাধীনতা ৭৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শিলিগুড়িতে ‘রান ফর ভারত’

স্বাধীনতা ৭৫ উদ্‌যাপন সমিতির উদ্যোগে গত ৭ আগস্ট শিলিগুড়ি শহরে ‘রান ফর ভারত’ নামে এক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। দুইভাগে অনুষ্ঠিত এই কার্যক্রমের প্রথমভাগে ৯ কিলোমিটার রোড রেস হয়, যাতে ১২০০ জন অংশগ্রহণ করেন। শিলিগুড়ি শহরের শালুগাড়া থেকে দৌড় শুরু হয়ে হিন্দি হাই স্কুলে শেষ হয়। দ্বিতীয় ভাগে ‘ড্রিম রান ওপেন ফর অল’ আয়োজিত হয়, যা হিন্দি হাই স্কুল থেকে শুরু হয়ে সারা শহর পরিক্রমা করে হিন্দি হাই স্কুলেই শেষ হয়। এতে দু’হাজার পুরষ ও মহিলা অংশগ্রহণ করেন। প্রেরণা এডুকেশন সোসাইটি এবং নর্থ বেঙ্গল হ্যান্ডিক্যাপড্ রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনেরাও অংশগ্রহণ করেন। হিন্দি হাই স্কুল প্রাঙ্গণের অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অলিম্পিয়ান পদ্মশ্রী যোগেশ্বর দত্ত। তিনি ‘দেশ গঠনে যুবশক্তির ভূমিকা’ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। রান ফর ভারত-এ অংশগ্রহণকারী ১০ জন পুরুষ ও ১০ জন মহিলাকে পুরস্কৃত করা হয়। শ্রীমতী সঞ্জিতা ওঁরাও ও শ্রীমান তিলক মণ্ডল যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে প্রথম হন।

স্বাধীনতা-৭৫ উদ্‌যাপন কমিটির উদ্যোগে বহরমপুরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

স্বাধীনতা-৭৫ উদ্‌যাপন কমিটি মুর্শিদাবাদ জেলার উদ্যোগে গত ১৪ আগস্ট বহরমপুর শহরের গ্রান্ট হল ও কলেজিয়েট স্কুলে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও অঙ্কন প্রতিযোগিতায় শহরের ৭৫০টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। 'বিপ্লবী সাজো' প্রতিযোগিতায় ৩০ জন অংশগ্রহণ করে। স্থানীয় শিশুমন্দিরের ভাই-বোনেরা দেশাত্মবোধক সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে। মায়েরা শঙ্খবাদন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার ওপর মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন কাটোয়া মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ড. রবিরঞ্জন সেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সবাইকেই শংসাপত্র দেওয়া হয়। কমিটির সভাপতি রঘুনাথগঞ্জ হাসাপাতালের চিকিৎসক ডাঃ অমিত বেরা এবং সম্পাদক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠভবনের অধ্যাপক ড. নিবিড় কুমার ঘোষের পরিচালনায় এই অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

মুম্বাইয়ে রাখিবন্ধন উৎসবে বাঙ্গালিরা

মুম্বাই বাঙ্গালি বিজেপি শাখার সভাপতি রঞ্জন চৌধুরীর উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্তের উপস্থিতিতে মুম্বাইয়ের দাদার স্থিত যশবন্ত ভবনের 'রাষ্ট্রীয় শিক্ষণ সংশোধনী সংস্থা'র সভাকক্ষে মুম্বাইয়ে বসবাসকারী বাঙ্গালি সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ রাখিবন্ধন উৎসবে মিলিত হন। পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত প্রখ্যাত গায়িকা সোমা বোসের কণ্ঠে 'ধনধান্য পুষ্পভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা' গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অদ্বৈতচরণ দত্ত। অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন রঞ্জন চৌধুরী। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের কর্মসূচি 'হর ঘর তিরঙ্গা'র কথা মাথায় রেখে জাতীয় পতাকা বিতরণ করা হয়। ভারতীয় সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করার লক্ষ্যে বাঙ্গালিদের এই রাখিবন্ধন রূপ নিয়েছিল এক মিলনমেলার।

সিউড়ী সরস্বতী শিশুমন্দিরে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপন

গত ১৫ আগস্ট সিউড়ী সরস্বতী শিশুমন্দিরে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সিউড়ি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী শুভানন্দ মহারাজ। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্য-সমাজের সম্পাদক তথা সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের পূর্বতন অধ্যাপক দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। প্রদীপ প্রজ্বলন ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন স্বামীজী , শ্রীমুখোপাধ্যায় ও শিশুমন্দিরের পরিচালন সমিতির সভাপতি সুনীল বিষ্ণু। মল্লিকা দিদিভাইয়ের স্বহস্তে নির্মিত ৭৫টি মাটির প্রদীপ ৭৫ জন অভিভাবকের হাত দিয়ে প্রজ্বলন করা হয়। স্বামী শুভানন্দ মহারাজ আশীর্বাণী প্রদান করেন। শিশুমন্দিরের দিদিভাইয়েরা সমবেত 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে' গানটি পবিবেশন করেন। অধ্যাপক দেবাশিস মুখোপাধ্যায় স্বাধীনতা-৭৫ বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন।

এরপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। শিশুমন্দিরের ভাই-বোনেরা নাচ, গান ও আবৃত্তি পরিবেশন করে। অনুষ্ঠান শেষে শহরের ৫ জন ডাক্তারবাবুর তত্ত্বাবধানে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে গোলাপগঞ্জে কবাডি প্রতিযোগিতা

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে মালদা জেলার কালিয়াচকের গোলাপগঞ্জে 'দেশের জন্য খেলো'র উদ্যোগে এক কবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীতে মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজু কর্মকার ও মাখন দাস। প্রতিযোগিতায় এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে ৮টি দল অংশগ্রহণ করে।

নক আউট এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয় মোথাবাড়ি এবং রানার্স হয় কালিনগর গোলাপগঞ্জ। প্রধান অতিথি বিশ্বনাথ রায় বিজয়ী দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন এবং রানার্স দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন গোলাপগঞ্জ সমিতির সভাপতি দেবাশিস তেওয়াড়ী। শ্রীতেওয়াড়ী তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে কবাডি খেলাকে একতা, সাহসিকতা ও দেশরক্ষার প্রতীক রূপে বর্ণনা করেন।

লোকগীতি দেশ ও জাতির পরিচিতি ঘটায়

শেখর সেনগুপ্ত

ছত্তিশগড়ে বছরে একবার-দু'বার আমি আজও হাজির হই। আশ্রয় নিয়ে থাকি মুখ্যত ভিলাই শহরে, যেখানে গড়ে উঠেছে বিশ্বখ্যাত ভিলাই স্টিলপ্ল্যান্ট—যার ডাইনোসোরের মতো চেহারা ও ব্যস্ততা লক্ষণীয়। আমার একমাত্র জামাতা ওই প্ল্যান্টেরই একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক। আমি সুড়ুৎ করে তাঁর ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ি। কন্যার ব্যস্ততা বেড়ে যায়, তার বাবার যে এটাই স্বাভাব। আপ্যায়নের জন্য প্রিপারেশনের সময়টুকু অবধি দেয় না। এসেই কৌতূহলের সদগতির তাগিদে কত জায়গায় যে আমফানের গতি তুলে ঘুরে বেড়াবে অতঃপর। এটা আমার সখ নয়। জানার তাগিদ। আবাসন প্রধান শহর ছেড়ে আমি ছোট ছোট টিলা ও বনাঞ্চল দ্বারা সংরক্ষিত এলাকাগুলিতে ঘুরতে আরম্ভ করি, সেখানকার জনজাতি অধ্যুষিত কম-বেশি দুর্গম এলাকাগুলিতে। কপাল ভালো, আজ অবধি কোনও হিংস্র ও শত্রুসন্ধানী মাওবাদীর মুখোমুখি হতে হয়নি। কিন্তু মোলাকাত হয়েছে বেশকিছু নিজেদের কালচারকে আঁকড়ে ধরা জনজাতি পরিবারের সঙ্গে। আমার মতো সাহেবি পোশাক-পরা বৃদ্ধের আগমনে চক্ষু তাদের প্রথমে চড়কগাছে উঠলেও পরে তারা এই আকাটকে যথেষ্ট মান্যতা দিয়েছে এবং আমার অনুরোধে সাড়া দিয়ে তাদের লোকসংগীতও শুনিয়েছে। বাহারি সুরের ওই গানগুলিতে কিন্তু দেশপ্রীতির স্পষ্ট উপস্থিতি; এমনকী তারা যে একসময় ইংরেজ তাড়াতে রক্ত ঝরিয়েছিল, তারও সাংগীতিক চিত্র আমি দেখেছি, শুনেছি সেই সকল লোকগীতিতে। ইত্যাকার সংগীতের সূচনাপর্ব খুঁজতে গিয়ে আমাকে পিছিয়ে যেতে হয়েছে ১৮৫৩ সালে।

জাতি হিসেবে ইংরেজদের যতই গরিমা থাক, ওদের প্রশাসনিক মানসিকতার বৈশিষ্ট্য হলো শোষণ, দেশপ্রেমীদের কণ্ঠরোধ এবং তাদের দ্বারা শোষিত ভিনদেশিদের ঐতিহ্য ও সৃষ্টিশীলতার গায়ে কর্দম লেপন।

ভারতীয় শিক্ষা ও তিতিক্ষার সঙ্গে মিলেমিশে থাকবার মতো হৃদয় তাদের কোনও কালেই ছিল না। এই সকল কুউদ্দেশ্যের স্বরূপ উদ্ঘাটনে ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় জনজাগরণী যে সকল সংগীত একসময় রচিত হয় এবং কণ্ঠে কণ্ঠে যার বিস্তার লাভ করে, আজ তাদের একটা বৃহৎ অংশকে আমরা আর শুনতে পাই না। বিশেষত দেশের জনজাতিদের দেশপ্রেমজ্ঞাপক গানগুলির সিংহভাগই কেমন যেন বিস্মৃতির অতলে গিয়ে ঠাঁই

নিল। শৈশবে কোনও কোনও দিন শুনতে পেতাম যে সব 'গাজির গান', আজ তো নিছকই স্মৃতি। সেই স্মৃতি হাতড়ে উদ্ধার করলাম মাত্র চারটি লাইন ঃ

হামদূত কালদূত ডাইনে আর বাঁয়,
তার মধ্যে বৈস্যা আছে যম রাজার মায়া
গাজির কোন গুণে
ত্বরাইয়া লও ভাই গাজির নামে।....

কেবল দেশাত্মবোধক কিছু গানকে আমরা আজও মনে রেখেছি এবং তাদের নিয়েই যতটুকু চর্চা। বাল্যের একটা অংশ আমি কাটিয়েছি পূর্ব বর্ধমান জেলার তৎকালীন গণ্ডগ্রাম 'তেজগঞ্জ'-এ। বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্রের নামানুসারে 'তেজগঞ্জ' নাম। ওই গ্রামেই রয়েছে ঐতিহাসিক বিদ্যাসুন্দর কালীবাড়ি। সুন্দর ছিলেন এক কালীসাধক; আর বিদ্যা ছিলেন বর্ধমান রাজপরিবারের এক পরমা সুন্দরী কন্যা। সুন্দরের সঙ্গে বিদ্যার প্রেম গাঢ়তর হয়ে উঠলে রাজ পরিবারের বাঘনখগুলি হিংস্র হয়ে ওঠে। তখন সাধক প্রেমিক সুন্দর এমন একটি সুড়ঙ্গ খনন করেন, যার মধ্য দিয়ে তিনি পৌঁছে যেতেন রাজবাড়ির বাগানে অপেক্ষারত রাজকন্যা বিদ্যার সমীপে। সেই সুড়ঙ্গের মুখেই স্থাপিত তেজগঞ্জের মা কালীর মূর্তি। এই ঘটনা বা কাহিনিকে নিয়ে আমি এক লোকগীতি বার বার শুনেছি শম্ভুদাস নামক এক 'কাওয়ালি গায়ক'-এর মুখে। কম করেও ঊনসত্তর বছর আগেকার কথা। আড়চোখে আয়নায় বৃদ্ধের চেহারাকে দেখি। স্মরণে আসে সেই লোকগীতির সামান্য ভগ্নাংশ ঃ—

'.... গুহাধরি আসিল বিদ্যা
সুন্দর তুমি কই?
তাকাও কন্দরে ওগো
ছাড়ি দিয়া মই।....'

ড. সুশীল ত্রিবেদীর মতো গবেষক একটু ভিন্ন কথা বলেছেন, 'আমরা আজ যে সকল লোকগীতিকে স্বদেশবন্দনা রূপে গ্রহণ করে থাকি, তাদের উৎস কিন্তু বিভিন্ন জনজাতিদের গীতিমাল্য। (Our well cultured songs for mother-land actually bear the identity of our tribal songs and culture)।

ভারতীয় লোকসংগীতে আগুনের যে লকলকে শিখা আমরা কোথাও কোথাও দেখতে পাই, তাদের অনেকেরই পশ্চাতে কিছু রয়েছে বাঙ্গলার সুঠাম লোকগীতি। আদুর গায়ে ডিঙিতে বসে ভাটিয়ালি গান গাইতে শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে সেই বাল্যকালেই। আবার র‍্যাদা ঘষে জানালার ফ্রেম তৈরি করার সময় কাঠের মিস্ত্রি গুনগুনিয়ে যে গান গেয়ে ওঠেন, সেখানে রয়েছে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক সূর্যসেনের প্রশস্তি। এটাও তো লোকগীতিই। বাঙ্গলার আদি লোকগীতির উৎস মুখ্যত দুটি—একদিকে প্রকৃতি ও স্বদেশ, অন্যদিকে আমাদের জীবনযাত্রা ও লোকাচার। উৎসব-পার্বণ, পারিবারিক তথা সামাজিক আচার-আচরণ এ সবই এসেছে লোকসংগীতে।

পূর্ণিমার রাতে ক্ষণ ভেসে যায়
তুমি কোথা খুঁজি মরি,
হায়-হায়-হায়।
এসো, প্রিয়তম আরও কাছে এসো
মুছে যাক সব কিছু, মিছা ঘুমঘোর।

জনশ্রুতির মাধ্যমে অগ্রগতি ঘটেছে সামন্য কিছু লোকগীতির। শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ের ওপর নির্ভরশীল তাদের বেঁচে থাকা। সুর ও ছন্দে পরিবর্তন এসেছে স্থানভেদে। সংগীতের নিখুঁতত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে স্বরলিপি তৈরি করবার রেওয়াজ ছিল অতীতে। মৌখিক সেতু ধরে গায়ক-গায়িকার ইচ্ছানুসারে গীত একটি সংগীতের ওপর অধিকার কায়েম করত অন্য একটি সংগীত। লোকগীতি নিয়ে স্বদেশে-বিদেশে প্রভূত গবেষণা হয়েছে। আজও হচ্ছে। একসময় খ্যাতিময়ী রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী নীলিমা সেনের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনাও করেছিলাম বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। তিনিই জানিয়েছিলেন এই বিষয়ের খ্যাতনামা গবেষক ডঃ হেরির নাম। আমি ড. হেরির একাধিক নিবন্ধ পাঠ করেছি। তিনিই বলেছেন, 'Folk tunes are the first esays made by man in distributing his notes so far express his feelings in terms of design... Folk music supplies an epitome of the principles upon with musical art is founded.

আমাদের সংস্কৃতিমনস্ক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজীও বলেছেন, দেশের হৃদয়কে যদি উপলব্ধি করতে চান, চলে যান দূর-দূর গ্রামাঞ্চলে এবং কান পেতে তাল ঠুকে শুনুন আমাদের ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীত সেখানকার লোকালয়ে ও প্রান্তরে প্রান্তরে।

ভারতের লোকসংগীত সমেত তাবৎ পুরাতনী সংগীতের ওপর দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন এই বঙ্গেরই শ্রীদেবকিশোর ঘোষ। এখানে আমি তাঁর একটি প্রণিধানযোগ্য বিশ্লেষণকে তুলে ধরলাম,

'The matter of keeping alive the ethenic charactristes of the art of Loksangeet is of prime importance which must be duly adhered to keeping in clear view the relevant traditional features inherent and natural spontanity of this musical art prevaling in our country from the Himalayas to the Indian Occean.

দেশের প্রতি আপনার যদি নির্ভেজাল ভালোবাসা থাকে এবং তার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে নিজেকে যদি যথার্থ অবহিত করতে চান, লোকসংগীতে কান পাতুন—যে লোকসংগীত নানাভাবে, নানা সুরে, নানা ভাষায় প্রবহমান হিমালয় থেকে আরম্ভ করে ভারত মহাসাগর অবধি। □

জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনার সহযোগীরা

দীপক খাঁ

আমরা যখন প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হই—তখন যদি একবার পিছন ফিরে দেখি—দেখতে পাই কত ভুলভ্রান্তি, আনন্দ- নিরানন্দ, সুখ-দুঃখ, আলস্য, স্বার্থপরতা ও পরশ্রীকাতরতায় পূর্ণ আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যুর অভিমুখের এই যাত্রাপর্ব। এই যাত্রাপথ অন্তত সরলরৈখিক নয়—অক্র, বক্র হয়ে পাহাড়ি পথ অতিক্রমণ করার মতো। এজন্য একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে অবলম্বন— মহাজনঃ যে গতঃ—সঃ পন্থা। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে একজন মহাপুরুষ উজ্জ্বল দীপশিখা হাতে অন্ধকার পথে দাঁড়িয়ে আছেন। কঠোপনিষদে তাই তাঁদের কাছে তত্ত্ব জেনে নেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই আচার্যদের আচরণই আমাদের আচরণীয়। এমন জীবনকথা আছে যা কাল্পনিক রহস্য উপন্যাসের থেকে চমকপ্রদ ও রোমাঞ্চকর অথচ একান্ত বাস্তব। এরকমই একটি চরিত্র—জগদীশচন্দ্র বসু। জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিব্যক্তি—''এ জীবন এক মহাক্রীড়াস্বরূপ—এই অন্ধকারের আস্তরণ ভেদ করে আমাদের অন্তর্নিহিত আলোকরশ্মি উদ্ভাসিত করুক দিগদিগন্তে'' এর জন্য মানুষকে হতে হবে খাঁটি। সম্মান, যশ, খ্যাতি, অর্থ যেগুলি মানুষের কাছে কাম্য, সেগুলির জন্য কখনও লালায়িত হওয়া নয়—এই বিষয়ে উদাসীন থেকে জীবনে যা পেয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকার মূর্ত প্রতীক ছিলেন জগদীশচন্দ্র।

তাঁর জীবনপথে চলার জন্য যেসব মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছেন—তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা, গান্ধীজী, ডাঃ নীলরতন সরকার ও রোম্যা রোল্যাঁর মতো মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ।

ইউরোপ সফর শেষে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে, রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রর বাড়িতে এক তোড়া ম্যাগনেলিয়া নিয়ে সংবর্ধনা দিতে যান। জগদীশ ও রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে তখন ৩৮ ও ৩৪ বছর। রবীন্দ্রনাথের কথায়, ''প্রবল সুখ-দুঃখের দেবাসুর মিলে অমৃতের জন্যে তখন তরুণ শক্তিকে মন্থন করছিল। বন্ধুদের এমন শুভ সময় আর হয় না।'' জগদীশচন্দ্রের দুর্দিনে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে সাহায্য করেছেন, কখনও উৎসাহ দিয়েছেন। কখনও অর্থ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন লোকের দ্বারস্থ হয়েছেন। বিলেতে থাকাকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজের কর্তৃপক্ষ যখন জগদীশচন্দ্রের বেতন-সহ ছুটি মঞ্জুর করল না, তখন জগদীশচন্দ্র দিশেহারা হয়ে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর অসহায়তার কথা জানিয়ে চিঠি লেখেন। জবাবে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, ''যেমন করিয়া হোক তোমার কার্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া ফিরিয়া আসিও না, যাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয় সে ভার আমি লইব।' 'বঙ্গদর্শন' কাগজে তিনি জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারগুলি সহজ বাংলাভাষায় দেশবাসীর কাছে উপস্থাপিত করতেন। আবার জগদীশচন্দ্র তাঁর একান্ত সুহৃদ রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। তিনি কবিকে লেখেন—''তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, আমি তা হইতে

দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লেখ যাহাতে অন্য ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হব।"

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম বর্ষপূতি উপলক্ষ্যে কলকাতার টাউন হলে ১৯৩১ সালের ২৭ ডিসেম্বর একটি সভা, মেলা প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার রাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য। সমগ্র অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন জগদীশচন্দ্র। জগদীশচন্দ্রর সঙ্গে যে মানপত্রটি রবীন্দ্রনাথকে প্রদান করা হয় তার খসড়া করেছিলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য 'গোল্ডেন বুক অব টেগোর' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনিই সভায় বইটি রবীন্দ্রনাথের হাতে অর্পণ করেন। এঁর প্রস্তাবক হিসাবে নাম ছিল গান্ধীজী, জগদীশচন্দ্র, রোম্যাঁ রোলাঁ, আইনস্টাইন ও গ্রিক কবি কস্টাস পালামাসের। পৃথিবীর ত্রিশটি বিভিন্ন দেশের কবি, লেখক, শিল্পী প্রভৃতি বিদগ্ধজনের লেখা বইটিতে স্থান পেয়েছিল।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে অবস্থান কালে স্বামী বিবেকানন্দের বিদেশিনী শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। পরাধীন দেশের মানুষ বলে জগদীশচন্দ্রকে বিদেশের মাটিতে প্রভূত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হত। নিবেদিতা তা দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হন। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান প্রতিভা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। ১৯০১ সালে রয়্যাল সোসাইটি জগদীশচন্দ্রের গবেষণালব্ধ প্রবন্ধের প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। সেই সময় থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত জগদীশচন্দ্রর যে তিনখানি বিখ্যাত গ্রন্থ বের হয়, নিবেদিতা তা সম্পাদনা করেই কর্তব্য সমাধান করেননি, বইগুলির অধিকাংশ ভাষা নিবেদিতারই। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক পরবর্তীকালে পারিবারিক অন্তরঙ্গতায় পরিণতি লাভ করে। প্রতি বছর পূজাবকাশে বহু দম্পতির সঙ্গে নিবেদিতা দার্জিলিং এবং গ্রীষ্মাবকাশে মুসৌরী, মায়াবতী প্রভৃতি স্থানে বেড়াতে যেতেন। শ্রীমতী অবলা বসুকে 'BO' এবং জগদীশচন্দ্র নিবেদিতার থেকে ১০ বছরের বড়ো হওয়া সত্ত্বেও Bairn অর্থাৎ খোকা বলে ডাকতেন। সহস্র প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে, মায়ের মমতা দিয়ে নিবেদিতা তাঁকে উৎসাহ দিতেন। নিবেদিতা তাঁকে 'Man of Science' বলে অভিহিত করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর দার্জিলিঙে ভগনী নিবেদিতা দেহত্যাগ করেন। তাঁর শয্যাপার্শ্বে ছিলেন বসু-দম্পতি। ১৮৯৫ সালে উইলহেলম রন্টজেনের X-ray আবিষ্কারের পর জগদীশচন্দ্র বেরিয়াম প্লাটিনোসায়ানাইডে tilm প্রস্তুত করে X-ray Machine তৈরি করেন। ডাঃ নীলরতন সরকার প্রায়ই হাত বা বা পিঠের হাড় ভাঙা রোগী নিয়ে হাজির হতেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেই জন্য ডাঃ সরকারকে ভারতবর্ষে প্রথম X-ray ব্যবহারকারী ডাক্তার হিসাবে গণ্য করা হয়। জগদীশচন্দ্রের ৮৫ নং আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতে যে সব জ্ঞানীগুণী বন্ধুদের নিত্য আনাগোনা ছিল তাদের একজন এই নীলরতন সরকার।

বন্ধু রবীন্দ্রনাথের মধ্যমা কন্যা রেণুকা দেবীর চিকিৎসা ডাঃ সরকার করছিলেন। রোগীকে হঠাৎ অক্সিজেন দেওয়ার প্রয়োজন হলো। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ সরকার ছুটলেন জগদীশচন্দ্রের কাছে একটা উপায় বের করার জন্য। জগদীশচন্দ্র ভাবলেন রুমকর্ফের Induction coil-এর সাহায্যে অক্সিজেনের মধ্যে তড়িৎ মোক্ষণের ফলে অক্সিজেন আংশিকভাবে ওজোনে (O_3) পরিণত হয়। ওজোন নিঃসৃত অক্সিজেন থেকে পারমাণবিক অবস্থায় অক্সিজেন মুক্ত হলে ওই অক্সিজেন আণবিক অক্সিজেনের তুলনায় বেশি সক্রিয়। এই ভাবনার অল্প সময়ের মধ্যে একটি যন্ত্র তৈরি করে ১৭ মার্চ, ১৯০৩ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র। সে যাত্রায় রেণুকাদেবী সুস্থ হয়ে উঠলেন।

মহামতি গোখলের মাধ্যমে গান্ধীজীর সঙ্গে পরিচিত হন জগদীশচন্দ্র। কিছুকাল গান্ধীজী জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে অতিথি হয়ে ছিলেন। গান্ধীজীর মতাদর্শের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের মতাদর্শ এক ছিল না। বিশেষত এই কারণে শুধুমাত্র চরকার মাধ্যমে, সমস্ত কলকারখানা বন্ধ করে দেশের উন্নতির পক্ষে জগদীশচন্দ্রের সায় ছিল না। এক সময় কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার চাপে গান্ধীজী জাতীয় সংগীতরূপে 'বন্দেমাতরম্' কে বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেন। জওহরলাল নেহরু সুভাষচন্দ্রকে জানালেন—"কংগ্রেসের আসন্ন বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গৃহীত হতে চলেছে।" শ্রীমতী অবলা বসু জগদীশচন্দ্রকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে (গান্ধীজীর উদ্দেশ) সমস্যাটির সমাধান করেন। বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের জনগণের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্য জগদীশচন্দ্র আবেদন জানালেন। ওই সময় গান্ধীজী "Young India" কাগজে লিখলেন---"আজ সকল ভারতবাসী আচার্য জগদীশচন্দ্রকে দেশবাসীরূপে পাইয়া গর্বিত। কারণ তিনি শুধু একজন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী নন, একদিন তাঁহার আবিষ্কারগুলি বিশ্বে শিল্প-বিপ্লব ঘটাইবে। এই জগতে বসু বিজ্ঞান মন্দির একটি মহান স্থান অধিকার করিবে।"

দেশে ফেরার পথে জগদীশচন্দ্র ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মার্চ সুইজারল্যান্ডের অপরিচিত রোমাঁ রোলাঁকে চিঠি লিখলেন। ইতোমধ্যে বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণের জীবনী লিখতে তিনি ব্যস্ত। তাই জগদীশচন্দ্র নিজের গবেষণা সম্পর্কে জানাবার জন্যই রোমাঁ রোলাঁকে চিঠি লিখেছিলেন। চিঠির সঙ্গে পাঠিয়ে ছিলেন তাঁর ইংরাজি পুস্তিকা 'সারকুলেশন অ্যান্ড অ্যাসিমিলেশন অব প্লান্টস'। তিনি জগদীশচন্দ্রের পুস্তিকা ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন আলোচনা সংগ্রহ করে পড়তে লাগলেন। দেশে ফিরে জগদীশচন্দ্র আর একখানি চিঠি লিখলেন রোমাঁ রলাঁকে। সেই সঙ্গে তাঁর লেখা দুটি বই 'রেসপন্স্ ইন দ্য লিভিং অ্যান্ড নন-লিভিং' এবং অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিজের 'দ্য লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্ক অব্ স্যার জে. সি. বোস'। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রোমাঁ রলাঁ প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ঘটে তিন বছর পর, ১৯২৭ সালে। জগদীশচন্দ্র রোমাঁ রলাঁর বাড়িতে সস্ত্রীক নিমন্ত্রিত। প্রথমবার সাক্ষাতে রোমাঁ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ১৯২৮ সালের ৩০ নভেম্বর জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে রোমাঁ রলাঁ চিঠি লিখলেন—"আপনার সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী উৎসবের জন্য যাঁরা উৎসাহে উদ্‌যোগ করছেন, আমি নিজেকে সেই দলে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। আমার নিজের তরফ এবং ফরাসি দেশের আপনার সমস্ত বন্ধুবর্গের পক্ষ থেকে আপনাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিরা আপনার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা যথার্থ উপলব্ধি করেন। আমি অভিনন্দন জানাই সেই সত্যদ্রষ্টা তপস্বীকে যিনি তাঁর কবি দৃষ্টি দিয়ে বৃক্ষবল্কল ও পাষাণের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা প্রাণ কণিকার সন্ধান পেয়েছেন।" □

পুলিশ হেফাজতে সঞ্জয় রাউত ও তাঁর স্ত্রী।

দুর্নীতির দাঁড়িপাল্লায় সমান তালে পাল্লা দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ও মুম্বাই

সুজিত রায়

কথায় বলে— দুর্নীতির কোনো দেশ নেই, ধর্ম নেই, জাত নেই, পাত নেই। তা না হলে দেশের দুই প্রান্তে দুটি ভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন রাজনৈতিক দলের দুর্নীতি সমার্থক হয়ে ওঠে কীভাবে?

পশ্চিমবঙ্গে যখন রাজ্যের প্রাক্তন শিল্প, শিক্ষা এবং পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলার সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্টবাবুর কয়েক হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি নিয়ে কলকাতা থেকে কোচবিহার সরগরম, তখনই মহারাষ্ট্রও একইভাবে উত্তপ্ত ভারতীয় শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউতের ১,০৩৪ কোটি টাকার প্রকাশ্য দুর্নীতি নিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গে যখন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের অভিযোগ— তিনি অন্তত একশো কোটি টাকার দুর্নীতি করেছেন শিক্ষা বিভাগে বেআইনি পথে চাকরি পাইয়ে দিয়ে এবং অনুব্রত মণ্ডল কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পদ বানিয়েছেন শুধুমাত্র পাথর খাদান, বালিখাদান এবং গোরুপাচারের অবৈধ গোপন ব্যবসা থেকে তখনই উদ্ধব ঠাকরের মুখ্যমন্ত্রীত্বে শিবসেনা দলের দাপুটে নেতা সঞ্জয় রাউত শুধু একটিমাত্র জমি কেলেঙ্কারিতেই হাতিয়ে নিয়েছেন ১,০৩৪ কোটি টাকা— অভিযোগ সিবিআইয়ের।

পশ্চিমবঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এখনও ইডি হেফাজতে জেল বাসিন্দা। অনুব্রত মণ্ডলকেও জেলে ঢোকাতে চলেছে সিবিআই। তবে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট সঞ্জয় রাউতকে ইতিমধ্যেই জেলবন্দি করে ফেলেছেন। পত্রা চাওল জমি কেলেঙ্কারীর নায়ক, হাত দিয়ে মাথা কাটতেন যিনি ঠাকরে মন্ত্রিসভার শাসনাধীন মহারাষ্ট্রে, সেই সঞ্জয় রাউত দিনেদুপুরে ডাকাতি করেছেন। ভেবেছিলেন, দলীয় প্রশাসন আর তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ই উতরে দেবে তাঁকে। সেটা হয়নি। অভিযোগের সমর্থনে কয়েক ট্রাঙ্ক বোঝাই দুর্নীতি সংক্রান্ত নথিপত্র নিয়ে ইডি তৈরি রাউতকে দীর্ঘমেয়াদী গারদ বন্দি করে ফেলার জন্য।

ঠিক কোন অপরাধে অভিযুক্ত সঞ্জয় রাউত?

এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, পত্রা চাওল জমি কেলেঙ্কারির সূত্রপাত হয়েছিল ২০০৭ সালে। পত্রা চাউল আসলে একটি জনপদ যেটি অধুনা সিদ্ধার্থনগর হিসেবে পরিচিত। উত্তর মুম্বাইয়ের শহরতলি অঞ্চল গোরেগাঁওয়ের ৪৭ একর জমিতে বিস্তৃত এই ছোট্ট জনপদ। এই জনপদে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা ছিল ৬৭২। মহারাষ্ট্র হাউসিং অ্যান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, পত্রা চাওলে তিন হাজার ফ্ল্যাট তৈরি হবে এবং ৬৭২টি পরিবারকে গড়ে দেওয়া হবে নতুন বাড়ি। সাময়িকভাবে ওই পরিবারগুলিকে অন্যত্র মাসিক ভাড়ায় সরিয়ে দেওয়া হবে এবং ভাড়া গুনবে মহারাষ্ট্র হাউসিং অ্যান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। অথরিটির এই উদ্যোগের সঙ্গে জয়েন্ট পার্টনার হিসেবে যোগ দেয় একটি বেসরকারি সংস্থা— গুরু অতীশ কনস্ট্রাকশান প্রাইভেট লিমিটেড। শর্ত ছিল— ৩০০০ ফ্ল্যাট এবং ৬৭২টি বাড়ি তৈরির পর অতিরিক্ত জমি বেসরকারী ডেভেলপারদের বিক্রি করা হবে।

২০০৭ সালেই সমস্তরকম চুক্তিপত্র সই হয়ে যায়। ৬৭২টি পরিবারও নির্বিবাদে অথরিটি নির্ধারিত বাড়িতে সাময়িকভাবে উঠে যান। কিন্তু চুক্তি সই করানোর ১৪ বছর

মেয়ের সঙ্গে অনুব্রত।

ফ ঃ ৫

পরেও পত্রা চাওল এলাকায় একটি ইটও না গাঁথা হওয়ায় এলাকার বাসিন্দাদের টনক নড়ে। কারণ তাঁরা অথরিটির প্রতিশ্রুতিমতো নিজেদের নতুন বাড়ি পাননি। শুধু তাই নয়, তাঁদের বাড়ি তৈরির জন্য নির্ধারিত জমিগুলিও ৯০১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকায় বেসরকারী প্রোমোটারদের বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। এখানেই শেষ নয়, গুরু অতীশ কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড The Meadows নামকরণ করে যে আবাসন প্রকল্পের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে ১৩৮ কোটি টাকা অগ্রিম আদায় করেছিল, তাও আত্মসাৎ হয়ে গেছে। কারণ The Meadows প্রকল্পের একটি ইটও গাঁথা হয়নি। এর চেয়েও ভয়ংকর অপরাধ ছিল যে ৬৭২টি পরিবারকে সাময়িকভাবে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছিল এবং ভাড়ার বাড়িতে তোলা হয়েছিল, তাঁদের ভাড়ার টাকা দেওয়া বন্ধ করা হয়। তাঁরা অথরিটির কাছে অভিযোগ জানাতে গিয়ে খবর পান যে তাঁদের জমিগুলোও ন'টি বেসরকারি প্রোমোটিং সংস্থাকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। অথচ তাঁদের জন্য একটি বাড়িও তৈরি হয়নি। মহারাষ্ট্র হাউসিং অ্যান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট খোঁজখবর করে জানতে পারে গোটা দুর্নীতিটা করেছে গুরু অতীশ কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড। ২০১৮-র জানুয়ারি মাসে অথরিটি গুরু অতীশ কনস্ট্রাকশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে উদ্যোগ নেয়। তখনই যে ৯ জন প্রোমোটার ৬৭২ জন বাসিন্দার জমি টাকা দিয়ে কিনেছিলেন তাঁরা অথরিটিকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা দায়ের করে। ফলে অথরিটি সমস্যায় পড়ে যায়। কিন্তু অথরিটি একটা ভালো সিদ্ধান্ত নেয়। তাঁরা ২০২০ সালে রাজ্যের মুখ্যসচিব জনি জোসেফের তত্ত্বাবধানে একটি এক সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে। ওই কমিটির বিচার্য বিষয় ছিল, প্রতারিত ৬৭২টি পরিবারের সমস্যার সমাধানে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা।

২০২১-এর জুন মাসে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নেয়। পত্রা চাওল প্রকল্প মুম্বাই হাউসিং অ্যান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি সম্পূর্ণ করবে এবং প্রতারিত সমস্ত বাসিন্দা ও ফ্ল্যাট ক্রয়কারীদের স্বার্থে যা যা করা দরকার তা করবে। সরকারিভাবে বলা হয় : 'MHADA itself will now be working on the entire project as a developer and will be providing 650 square feet carpet area flats to the 672 tenants through the redevelopment project.'

সরকারিভাবে দুর্নীতি ধরা পড়ার পর এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট গুরু অতীশ কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেডের মোট ১,০৩৯ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে আইনি কার্যাবলী গ্রহণের কথা সরকারিভাবেই জানানো হয়।

তদন্ত চলাকালীন জানা যায়, পত্রা চাওল-এর ৪৭ একর জমিতে ৬৭২টি বাড়ি ও তিন হাজার ফ্ল্যাট তৈরির জন্য যে সংস্থার সঙ্গে মহারাষ্ট্র হাউসিং অ্যান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চুক্তি হয়েছিল সেই গুরু অতীস কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেডের তিন ডিরেক্টর অন্যতম হলেন প্রবীণ রাউত।

এই প্রবীণ রাউতই গোটা কেলেঙ্কারির নায়ক। কিন্তু তখনও পর্যন্ত জানা যায়নি, প্রবীণ রাউতকে সামনে রেখে পুরো খেলাটাই খেলছেন শিবসেনার রাজ্যসভার সদস্য সঞ্জয় রাউত যাঁর জিগরি দোস্ত হলেন প্রবীণ রাউত। এবং গোটা কেলেঙ্কারীতে বেআইনিভাবে নানাভাবে অর্থোপার্জন এবং তা বিনিয়োগে ব্যবহার হয়েছে ১০৩৯ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। এইসব বিনিয়োগ হয়েছে কখনও সঞ্জয় রাউতের স্ত্রী বর্ষা রাউতের নামে, কখনও বা সঞ্জয় রাউতের আর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুজিত পাটকরের এবং তাঁর স্ত্রী স্বপ্না পাটকারের নামে। বেশিরভাগ অর্থই বিনিয়োগ করা হয়েছে নানা স্থাবর সম্পত্তিতে।

প্রথম ধরা পড়েন প্রবীণ রাউত। তিনি সরাসরি ১০০ কোটি টাকা সরিয়েছেন তাঁর নিকটজন, পরিবারের সদস্যবর্গ এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে। কিছু অর্থ দেওয়া হয়েছে সরাসরি সঞ্জয় রাউতকে। প্রবীণ রাউতের স্ত্রী মাধুরী রাউতের অ্যাকাউন্ট থেকে ৮৩ লক্ষ টাকা সরাসরি অথবা গোপনে হস্তান্তরিত হয়েছে সঞ্জয় রাউতের স্ত্রী বর্ষা রাউতের নামে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, সেই টাকা ব্যবহৃত হয়েছে দাদারে একটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কেনায়। আবার বর্ষা রাউতের মাধ্যমে ৫৫ লক্ষ টাকা হস্তান্তরিত হয়েছে মাধুরী রাউতের কাছে। সেই টাকায় আলিবাগের কিহিম বিচের কাছে জমি কেনা হয়েছে বর্ষা রাউত এবং স্বপ্না পাটকরের নামে। এই জমি কেনার জন্য বেশ মোটা অঙ্কের অর্থ নগদে ব্যবহার করা হয়েছে।

এরপরেই সঞ্জয় রাউতের বাড়িতে তল্লাশি চালায় এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট। রাউতের বাড়িতে নগদ উদ্ধার হয় সাড়ে এগারো লক্ষ টাকা। প্রাথমিক পর্যায়ে সঞ্জয় রাউত চরম অসহযোগিতা করছিলেন তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ন' ঘণ্টার টানা জেরায় তিনি বলে ওঠেন— এসব কিছুর মূলে রয়েছেন সুজিত পাটকরের স্ত্রী স্বপ্না পাটকর। গ্রেপ্তার করা হয় সঞ্জয় রাউতকে। বাকি অপরাধীরা দুর্নীতির বাকি টাকা কে কোথায় কীভাবে সরিয়েছেন অথবা সত্যিই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত অর্থের পরিমাণ আরও বেশি কিনা তা এখনও পরিষ্কার নয়।

বঙ্গোপসাগরের তীরে পশ্চিমবঙ্গ আর আরব সাগরের তীরে মুম্বাইয়ের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব কম নয়। কিন্তু রাজনৈতিক মহলের দুর্নীতির ইস্যুতে দুটি রাজ্যের মধ্যে দূরত্ব স্বল্পই। লক্ষ্যনীয়, দুটি রাজ্যেই শাসক দলের পক্ষ থেকে সরাসরি দুর্নীতিতে যুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষেই সওয়াল করা হচ্ছে। এর কারণ সম্ভবত একটাই— দুটি রাজ্যেরই বিজেপি বিরোধী শাসকদল আরও ব্যাপকভাবে দুর্নীতিতে যুক্ত এবং নেতৃত্ব আশঙ্কিত যে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো নেতৃত্বের ধরপাকড়ে ভরাডুবি হবে মৌরসী পাট্টা হিসেবে গেড়ে বসার রাজনীতির।

পশ্চিমবঙ্গে এখন পর্যন্ত দুর্বৃত্তের সংখ্যা দুই। কিন্তু বেসরকারি ভাবে জানা যায়, অনুব্রত মণ্ডলের কয়েক হাজার কোটি টাকার দুর্নীতিতে জড়িয়ে আছেন আরও ৭২ জন। তাদের মধ্যে যেমন আছেন চুনোপুঁটির দল, তেমনি আছেন রাঘব বোয়ালেরাও। কিন্তু সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা হলো— ধরা পড়েন চুনোপুটিরাই। রাঘব বোয়ালেরা অধরাই থেকে যান। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে কয়েকজন নেতা ও মন্ত্রী 'আমি তো কলা খাইনি' বলে আদালতে গিয়েছেন আগাম জামিনের আবেদন নিয়ে। কেন গেলেন তাঁরা? এ প্রশ্ন আজ কুরে কুরে খাচ্ছে সাধারণ মানুষের মনকে। তাঁদের প্রশ্ন একটাই— চিটফান্ড কাণ্ডে হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতিতে সর্বস্বান্ত হয়েছে হাজার হাজার পরিবার। সিবিআইয়ের তদন্ত আজও কোনো আশার আলো দেখাতে পারেনি তাঁদের। এখন আবার মন্ত্রীর বাড়িতে কোটি কোটি কাঁচা টাকা উদ্ধার হচ্ছে। মিলেছে একর একর জমির সন্ধান। হয়তো আগামী দিনে ধরা পড়বে আরও গোরু চোর মন্ত্রী, পাথর চোর সান্ত্রী, বালি চোর পেয়াদা। সে পশ্চিমবঙ্গই হোক, কিংবা মুম্বাই। পার্থ চ্যাটার্জি, অনুব্রত মণ্ডল কিংবা সঞ্জয় রাউত। প্রবীণ রাউত। এবং অবশ্যই অর্পিতা কিংবা বর্ষা বা স্বপ্নারা। এর শেষ কোথায়?

আজ্ঞে হ্যাঁ, জানতে চাইছি সিবিআইয়ের কাছে। জানতে চাইছি এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের কাছে। জানতে চাইছি আইবি, সিআইডি-র কাছে। আর জানতে চাই মহামান্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে— আর কতদিন? আর কতদিন বলির পাঁঠা হবে দেশের সাধারণ মানুষ? □

মা কালী বিতর্কে হিন্দু বাঙ্গালির ভাবনা

কল্যাণ চৌবে

শুরুতে বিতর্কের মূল বিষয়টা বুঝে নেওয়া যাক। জুলাই মাসের তিন তারিখে পরিচালক লীনা মণিমেকালাই একটি টুইট করেন। তাতে আমাদের আরাধ্য মা কালীর ছবি এমনভাবে দেওয়া হয় যা সাধারণভাবে হিন্দু বাঙ্গালি মননশীলতার সঙ্গে মেলে না। এখানে হিন্দু এবং বাঙ্গালি এই দুটি বিষয়েরই গুরুত্ব আছে। এই নিয়ে খুব সন্দেহের অবকাশ নেই যে 'বাঙ্গালি হিন্দু' অপেক্ষাকৃত বেশি উদারবাদী। তুলনায় ভারতবর্ষের উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম অংশে হিন্দুধর্মের মানুষেরা রক্ষণশীল। যে মানুষ রক্ষণশীল তাকে হঠাৎ করে উদারবাদী বানানোর মধ্যে কোনো কৃতিত্ব নেই, যদি না রক্ষণশীল মানুষটিও উদারবাদীদের উৎপাত না করে। অর্থাৎ যে রক্ষণশীল হিন্দু ব্রাহ্মণ আমিষ ভক্ষণ করেন না, তার সামনে হইচই করে গোমাংস খাওয়ার উৎসব করা উদারবাদের অংশ হতে পারে না।

আলোচনা ও বিশ্লেষণ এই জায়গাতেই। ছবি করেছেন লীনা মহাশয়া। তাই নিয়ে হইচই সমাজমাধ্যমে। সেখান থেকেই বিতর্ক যে মা কালীকে আমরা কেমন ভাবে দেখব। আমি আমার মনে যেমন খুশি দেখতে পারি, যতক্ষণ না তা প্রচার করছি। কিন্তু যখন আমার ভাবনা আমি ছড়িয়ে দিচ্ছি জনমানসে, তখন সেই ভাবনা কেউ মানবেন, কেউ-বা মানবেন না। খুব স্বাভাবিক ভাবেই বিরুদ্ধপন্থীদের প্রতিবাদ থাকবেই। দেব-দেবীর বিভিন্ন রূপ। সেখানে ভক্ত মানুষ মা কালীর ভিন্ন ভক্তিময় রূপ দেখেন। সেই কারণেই ধূমপানরতা মা কালীর ছবির প্রতিক্রিয়ায় তীব্র প্রতিবাদ এবং গোটা সমাজের গর্জে ওঠাটাই স্বাভাবিক। আমাদের দেশে তো ধূমপানের বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন বাধা। সিগারেটের প্যাকেটে বীভৎস ছবি ছাপানো হয় কর্কট রোগাক্রান্ত মুখ বা ফুসফুসের। সেখানে মা কালীকে ধূমপানরতা রূপে পেশ করে যদি উদারবাদের মহত্ত্ব বর্ণনা করা হয়, তার বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রতিবাদ স্বাভাবিক।

এবার প্রশ্ন হলো, প্রতিবাদের বিভিন্ন রূপ। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি যে ভীষণভাবে আমাদের দেশে জড়িয়ে আছে, তা শুরু হয়েছিল গান্ধীজীর সময় থেকেই। 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' অর্থাৎ রাজনীতিতে শ্রীরাম তখনো প্রাসঙ্গিক ছিলেন।

আজকের দিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেমন সবকা সাথ, সবকা বিকাশের ডাক দিয়েছেন তেমনই হিন্দুদের সুরক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। শুধু হিন্দু-বা বলি কেন? তিন তালাক প্রথার বিরুদ্ধে বিজেপি সরকারের করা আইন তো সত্যিই মুসলমান সম্প্রদায়ের মহিলাদের মুক্তির পথ দেখিয়েছে।

২০০৪ সালে যখন বামপন্থীদের সমর্থনে কংগ্রেসের সরকার, তখন মুসলমান নারীদের নিয়ে ভাবার সুযোগ তো পেয়েছিলেন এ দেশের তথাকথিত উদারবাদীরা। অর্থাৎ তাদের কাছে এই প্রশ্ন থাকবে, যে সংখ্যালঘু শোষিত মহিলাদের অত্যাচারী পুরুষতন্ত্রের হাত থেকে উদ্ধার বনাম মা কালীর ধূমপান— এর মধ্যে কোনটি বেশি পছন্দ করবেন? আমাদের দেশ বৈচিত্র্যময়, আর তার মধ্যে ঐক্য অবশ্যই জাতীয়তাবোধের স্তম্ভ।

সেইখানে উদারবাদ ও রক্ষণশীলতার মধ্যে দ্বন্দ্ব, পরিণত গণতন্ত্রকে পুষ্ট করে। কিন্তু সমাজমাধ্যমে যদি ধূমপানরতা মা কালীর ছবি পছন্দ না হয়, সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ আন্দোলন চলবে এবং এই বাঙ্গলার সচেতন মানুষ তা পছন্দ করবেন। প্রয়োজনে দেশের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে তাদের বিরুদ্ধে, যারা উদারবাদের নামে ধর্ম নিয়ে খেলা করছেন। হিন্দু বাঙ্গালির উদারবাদকে তার দুর্বলতা ভাবার কোনো কারণ নেই।

সবশেষে বলতে হয় যে সংখ্যাগুরু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দেশ এই বিশ্বে নগণ্য, তার মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষই শক্তিশালী। অন্যদিকে সেখানকার রাজ্য হিসেবে এই বাঙ্গলাই দেশভাগের যন্ত্রণায় আঘাত পেয়েছে সবথেকে বেশি। আজকের দিনে সেই বাঙ্গলা থেকে তৃণমূলের প্রতীকে নির্বাচিত সাংসদ যখন মা কালীকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেন, তা আসলে ক্ষতি করে আমাদের দেশের, গোটা বিশ্বের সামনে প্রকাশ করে আমাদের দুর্বলতা। এই বিশ্বের বহু দেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যালঘু। তাদের ওপর বিভিন্ন দেশে যে মোল্লাবাদী আক্রমণ চলছে সে খবর কারও অজানা নয়। প্রতিবেশী বাংলাদেশেই দুর্গা বা কালীপূজা নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকেন সংখ্যালঘু হিন্দুরা।

সেই জায়গায় হিন্দু সংখ্যাগুরু দেশের সাংসদ যদি নিজের ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষায় সচেষ্ট না হয়ে উদারবাদের মোড়কে মা কালীকে হেয় করেন, তা আসলে দুর্বল করবে আমাদের গোটা দেশকে। যে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ ভারতকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে আজকের বিজেপি সরকার, সেখানে উদারবাদের মোড়কে অন্য দেশের ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন তৃণমূল সাংসদ। এর প্রতিবাদ হওয়া উচিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। সনাতনী হিন্দু ভাবনার প্রেক্ষিতে এর প্রতিবাদ হওয়া উচিত গোটা দেশের অখণ্ডতার স্বার্থে, এর প্রতিবাদ হওয়া উচিত সমগ্র বিশ্বে ভারতবর্ষকে প্রথম সারিতে পৌঁছে দেওয়ার প্রেক্ষিতে। ধর্ম নিয়ে ঠুনকো মন্তব্য উদারবাদী ভাবনার পথ নয়। সে পথের আলো দেখা যায় একমাত্র জাতীয়তাবোধ এবং ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যায়। □

খেলো ইন্ডিয়ার সুফল পেতে শুরু করেছে ভারত

নিলয় সামন্ত

টোকিয়ো অলিম্পিক্সে আজ পর্যন্ত প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সব থেকে ভাল পারফর্ম করেছে ভারত। এমনকী সে দেশে হওয়া প্যারালিম্পিক্সেও ভারতের পদকের তালিকা নেহাত কম নয়। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়া নীতির প্রশংসা বোধহয় নিন্দুকেরাও করতে বাধ্য হবেন। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, পদক জয় নয়, প্রতিনিধিত্ব করাটাই বড়ো কথা। সেই ভাবধারাতেই এতদিন আন্তর্জাতিক আঙিনায় প্রতিনিধিত্ব করেছে ভারত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে। এই সরকারের 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পের হাত ধরে উঠে আসছে বহু ক্রীড়াবিদ। আর তারই ফল হাতেনাতে পাওয়া যাচ্ছে খেলার আন্তর্জাতিক মঞ্চে।

কমনওয়েলথ গেমসে মোট ২২টি সোনা (সব মিলিয়ে ৬১টি পদক) পেয়েছে ভারত। পদক তালিকায় অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও কানাডার পরে চতুর্থ স্থানে শেষ করেছেন পিভি সিন্ধুরা। অ্যাথলেটিক্স থেকে শুরু করে কুস্তি, বক্সিং, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিসে সোনা জিতেছেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা।

সব থেকে বেশি সোনা এসেছে কুস্তিতে। ভারতের ছয় কুস্তিগির কমনওয়েলথ গেমসের পোডিয়ামে জাতীয় সংগীত বাজিয়েছেন। ভারোত্তোলন, বক্সিং, ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিসে তিনটি করে সোনা এসেছে ভারতের। লন বোলে এই প্রথম সোনা পেয়েছে ভারত। অ্যাথলেটিক্সেও সোনা এসেছে। এ ছাড়া দু'টি সোনা জিতেছেন ভারতের প্যারা-অ্যাথলিটরা।

২২ সোনা, ৬১ পদক জিতে চতুর্থ ভারত। পদক এল নতুন চার খেলা থেকে। এক নজরে ভারতের ২২ সোনাজয়ী : অচিন্ত্য শিউলি (ভারোত্তোলন, পুরুষদের ৭৩ কেজি) : পশ্চিমবঙ্গের ২০ বছরের এই ভারোত্তোলক এবারই প্রথম কমনওয়েলথ গেমসে নেমেছিলেন। নিজের বিভাগে মোট ৩১৩ কেজি (স্ন্যাচে ১৪৩ কেজি ও ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১৭০ কেজি) ভার তুলেছেন তিনি, যা গেমস রেকর্ড। এর আগে ২০২১ সালে জুনিয়র বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় রুপো জিতেছেন অচিন্ত্য। কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপেও দু'বার সোনা জিতেছেন তিনি। জেরেমি লালরিননুঙ্গা (ভারোত্তোলন, পুরুষদের ৬৭ কেজি) : মিজোরামের ছেলে জেরেমি নিজের বিভাগে মোট ৩০০ কেজি (স্ন্যাচে ১৪০ কেজি ও ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১৬০ কেজি) ভার তুলেছেন। ১৯ বছরের এই তরুণ ভারোত্তোলক ২০১৮ সালে গ্রীষ্মকালীন যুব অলিম্পিক্সে ছেলেদের ৬২ কেজি বিভাগে ভারতের হয়ে সোনা জিতেছিলেন। কমনওয়েলথেও দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন তিনি।

মীরাবাই চানু (ভারোত্তোলন, মহিলাদের ৪৯ কেজি) : টোকিয়ো অলিম্পিক্সে একটুর জন্য সোনা হাতছাড়া হয়েছিল। কিন্তু কমনওয়েলথে হাসতে হাসতে সোনা জিতেছেন মণিপুরের এই মেয়ে। নিজের বিভাগে মোট ২০১ কেজি (স্ন্যাচ ৮৮ কেজি ও ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ১১৩ কেজি)

ভার তুলেছেন তিনি।

রূপা রানি তিরকে, লাভলি চৌবে, নয়নমণি সাইকিয়া ও পিঙ্কি সিংহ (মহিলাদের লন বোল) : এই প্রথম লন বোলে সোনা জিতেছে ভারত। সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ড ও ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে সোনা জিতেছেন তাঁরা।

বজরং পুনিয়া (কুস্তি, পুরুষদের ৬৫ কেজি) : টোকিয়ো অলিম্পিক্সে না পারলেও কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিতেছেন বজরং। কমনওয়েলথ গেমসে পদকের হ্যাটট্রিক করেছেন এই কুস্তিগির। ২০১৪ সালে গ্লাসগোতে রুপো ও ২০১৮ সালে গোল্ড কোস্টে সোনা জিতেছিলেন তিনি।

সাক্ষী মালিক (কুস্তি, মহিলাদের ৬২ কেজি) : ফাইনালে পিছিয়ে পড়েও সোনা জিতেছেন হরিয়ানার এই কুস্তিগির। এর আগে ২০১৪ সালে গ্লাসগোতে মহিলাদের ৫৮ কেজি বিভাগে রুপো ও ২০১৮ সালে গোল্ট কোস্টে মহিলাদের ৬২ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি। প্রথম ভারতীয় মহিলা কুস্তিগির হিসাবে ২০১৬ সালের রিয়ো অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন সাক্ষী।

দীপক পুনিয়া (কুস্তি, পুরুষদের ৮৬ কেজি) : ফাইনালে পাকিস্তানের মহম্মদ ইনামকে হারিয়ে সোনা জিতেছেন দীপক। ভারতীয় সেনাবাহিনীর জুনিয়র কমিশনড অফিসার (জেসিও) দীপক ২০১৯ সালের বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতায় ৮৬ কেজি বিভাগে রুপো জিতেছিলেন।

রবি কুমার দাহিয়া (কুস্তি, পুরুষদের ৫৭ কেজি) : কুস্তিতে ভারতকে আরও একটি সোনা এনে দিয়েছেন রবি। ফাইনালে নাইজিরিয়ার এবিকেওয়েনিমো ওয়েলসনকে ১০-০ পয়েন্টে হারিয়েছেন তিনি। ২০২০ সালের টোকিয়ো অলিম্পিক্সে রুপো ও ২০১৯ সালের বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি। এ ছাড়া তিন বার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন রবি।

বীনেশ ফোগাট (কুস্তি, মহিলাদের ৫৩ কেজি) : কমনওলেথ গেমসে সোনার হ্যাটট্রিক করেছেন বীনেশ। এর আগে ২০১৪ সালে গ্লাসগো ও ২০১৮ সালে গোল্ড কোস্টেও নিজের বিভাগে সোনা জিতেছিলেন তিনি। ২০১৮ সালে জাকার্তা এশিয়ান গেমসেও সোনা জিতেছিলেন বীনেশ।

নবীন মালিক (কুস্তি, পুরুষদের ৭৪ কেজি) : প্রথম বার কমনওয়েলথ গেমসে খেলতে নেমে সোনা জিতেছেন ১৯ বছরের নবীন। ফাইনালে পাকিস্তানের মহম্মদ শরিফ তাহিরকে হারিয়েছেন তিনি। গত বছর অনূর্ধ্ব-২৩ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ও চলতি বছরে অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপেও সোনা জিতেছিলেন নবীন।

নিখাত জারিন (বক্সিং, মহিলাদের ৫০ কেজি) : নিখাতের মতো কমনওয়েলথ গেমসে নিজের প্রথম সোনা জিতেছেন অমিতও। আন্তর্জাতিক বক্সিং সংস্থার বিচারে ৫২ কেজি বিভাগে এখন বিশ্বের এক নম্বর বক্সার তিনি। তিনিই এক মাত্র ভারতীয় পুরুষ বক্সার যিনি বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জিতেছেন।

নীতু ঘাঙ্ঘাস (বক্সিং, মহিলাদের ৪৮ কেজি) : মেয়েকে বক্সার বানানোর জন্য তিন বছর অবেতন ছুটি নিয়েছিলেন বাবা জয় ভগবান। বাবার স্বপ্নপূরণ করেছেন নীতু। কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিতেছেন। এর আগে ২০১৭ ও ২০১৮ সালে যুব বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন তিনি।

পিভি সিন্ধু (ব্যাডমিন্টন, মহিলাদের সিঙ্গলস) : কমনওয়েলথের শেষ দিন ব্যাডমিন্টন থেকে তিনটি সোনা জিতেছে ভারত। তার মধ্যে প্রথম সোনা এনেছেন সিন্ধু। ফাইনালে কানাডার মিশেল লি-কে স্ট্রেট গেমে হারিয়েছেন তিনি। এর আগে ২০১৪ সালে গ্লাসগোতে ব্রোঞ্জ ও ২০১৮ সালে গোল্ড কোস্টে রুপো জিতেছিলেন সিন্ধু।

লক্ষ্য সেন (ব্যাডমিন্টন, পুরুষদের সিঙ্গলস) : ফাইনালে প্রথম গেম হারার পরেও হাল ছাড়েননি লক্ষ্য। পরের দু'টি গেম জিতে সোনা জিতেছেন তিনি। এর আগে অল ইংল্যান্ড ও জার্মান কাপে রানার-আপ হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। চলতি বছর ভারতের থমাস কাপজয়ী দলে ছিলেন তিনি। কমনওয়েলথেও এবার লক্ষ্যভেদ করলেন লক্ষ্য।

চিরাগ শেট্টি, সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরোড্ডি (ব্যাডমিন্টন, পুরুষদের ডাবলস) : ইংল্যান্ডের বেন লেন ও সিন ভেন্ডি জুটিকে স্ট্রেট গেমে হারিয়ে সোনা জিতেছেন ভারতীয় জুটি। এর আগে ২০১৮ সালে গোল্ড কোস্টে রুপো জিতেছিলেন সাত্ত্বিকরা। কমনওয়েলথ গেমসে ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের ডাবলসে এই প্রথম সোনা এসেছে।

অচন্ত শরথ কমল (টেবিল টেনিস, পুরুষদের সিঙ্গলস) : ২০০৬ সালের মেলবোর্ন কমনওয়েলথ গেমসে টেবিল টেনিসে সোনা জিতেছিলেন শরথ কমল। ১৬ বছর পরে ফের সোনা জিতলেন তিনি। ৪০ বছর বয়সি শরথ ফাইনালে ইংল্যান্ডের পিচফোর্ডকে দাঁড়াতে দেননি। জিতেছেন ৪-১ গেমে। কমনওয়েলথ গেমসে মোট ১৩টি পদক জিতেছেন শরথ।

শরথ কমল, শ্রীজা আকুলা (টেবিল টেনিস, মিক্সড ডাবলস) : মহিলাদের সিঙ্গলসে ব্রোঞ্জ হাতছাড়া হলেও অভিজ্ঞ শরথ কমলের সঙ্গে জুটিতে মিক্সড ডাবলসে সোনা জিতেছেন শ্রীজা। ফাইনালে মালয়েশিয়ার প্রতিপক্ষকে ৩–১ গেমে হারিয়েছেন তাঁরা।

শরথ কমল, জি সাথিয়ান, হরমিত দেশাস, সানিল শেট্টি (টেবিল টেনিস, পুরুষদের দলগত বিভাগ) : মহিলারা ব্যর্থ হলেও পুরুষদের দলগত বিভাগে সোনা জিতেছে ভারত। সিঙ্গলসে শরথ হারলেও নিজেদের দু'টি সিঙ্গলসে জিতেছেন সাথিয়ান ও হরমিত। সিঙ্গাপুরের প্রতিপক্ষকে ডাবসলওে হারিয়েছেন সাথিয়ান-হরমিত জুটি।

এলডস পল (অ্যাথলেটিক্স, পুরুষদের ট্রিপল জাম্প) : কেরলের এলডস পুরুষদের ট্রিপল জাম্পে সোনা জিতেছেন। ফাইনালে ১৭.০৩ মিটার লাফিয়েছেন তিনি।

সুধীর (প্যারা-পাওয়ারলিফটিং) : প্যারা-অ্যাথলিট হিসাবে বার্মিংহামে প্রথম সোনা জিতেছেন সুধীর। পুরুষদের হেভিওয়েট বিভাগে ২১২ কেজি ভার তুলে ১৩৪.৫ পয়েন্ট পেয়েছেন তিনি। গেমস রেকর্ড গড়ে সোনা জিতেছেন সুধীর।

ভাবিনা পটেল (প্যারা-টেবিল টেনিস, মহিলাদের সিঙ্গলস সি ৩–৫ বিভাগ) : কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম সোনা জিতেছেন ভাবিনা। এর আগে টোকিয়ো প্যারালিম্পিক্সে রুপো জিতেছিলেন তিনি।

শুরু করেছিলাম 'খেলো ইন্ডিয়া'র সাফল্যের খতিয়ান দিয়ে। শেষ করছি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পিতামহসম একটা মন্তব্য দিয়ে। যা গোটা বিশ্বে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। পূজা গেহলট একজন কুস্তিগির। কমনওয়েলথ গেমসে সে ব্রোঞ্জ পদক পায়। তাতে সে এতটাই দুঃখিত হয় যে সে ভারতবাসীর কাছে ক্ষমা চায়। তাতে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'আমরা তোমার খেলা উপভোগ করেছি। আমরা তোমার প্রচেষ্টাকে সম্মান করি। এজন্য দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই'। মোদীর এই মন্তব্য এখন বিশ্বজুড়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি থেকে শুরু করে সাধারণের সোশ্যাল মিডিয়াতেও প্রশংসা পেয়েছে।

পাকিস্তানের মতো দেশের এক সাংবাদিক মোদীর মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলেছেন এই জন্যই ভারতীয় খেলোয়াড়দের এত সাফল্য। পাকিস্তানের কোনও নেতা মন্ত্রীকে কখনও এভাবে খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করতে দেখিনি। □

শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর

বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব একবার রাজপুরোহিতের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। রাজপুরোহিত পুত্রের ঠিকুজি তৈরি করে জানতে পারলেন, তাঁর পুত্র একদিন সমগ্র জম্বুদ্বীপের শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হবে। পুরোহিতের পুত্র জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ ব্রহ্মদত্ত দেখলেন, তাঁর অস্ত্রাগারের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র আলোকিত হয়ে উঠল। মহারাজ কিছু বুঝতে পারলেন না। রাজপুরোহিত তাঁর পুত্রপ্রাপ্তির শুভসংবাদ নিয়ে রাজদরবারে প্রবেশ করে দেখলেন মহারাজা ব্রহ্মদত্ত বিষণ্ণ বদনে বসে আছেন। জিজ্ঞাসা করলেন , মহারাজ, আপনাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?

দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে মহারাজ বললেন। গতকাল রাতে অস্ত্রাগারের সমস্ত অস্ত্র ঝলসে উঠেছিল, তার কারণ বুঝতে না পেরে চিন্তিত আছি। রাজপুরোহিত বললেন, মহারাজ, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, আপনার রাজ্যে এক মহাবীরের জন্ম হয়েছে, তারই শুভাগমন বার্তা পৌঁছে গিয়েছে আপনার কাছে।

মহারাজের মুখে হাসি ফুটে উঠল। রাজপুরোহিতের ঘর আলো করে জন্মগ্রহণ করেছে পুত্র। তার নাম রাখা হলো জ্যোতিঃপাল। যথাসময়ে মহারাজ তাঁকে শ্রেষ্ঠ আচার্যের কাছে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠালেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়,জ্যোতিঃপাল মাত্র সাতদিনের মধ্যেই সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠল। গুরুদেব জ্যোতিঃপালের আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হয়ে উপহারস্বরূপ নিজের অস্ত্র ও উষ্ণীষ তার হাতে তুলে দেন এবং বলেন, এবার থেকে তুমিই এই গুরুকুলের সমস্ত ছাত্রের শিক্ষক হবে। গুরুদেবের কথামতো জ্যোতিঃপাল সমস্ত ছাত্রের শিক্ষায় মন দিলেন।

ষোলো বছর অতিক্রান্ত হলে জ্যোতিঃপাল বারাণসীতে ফিরে এলেন। মহারাজা ব্রহ্মদত্ত জ্যোতিঃপালকে দৈনিক এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। একটা বালকের এত টাকা বেতন দেখে অমাত্যরা ঈর্ষা করতে শুরু

করলেন। মহারাজকে তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, জ্যোতিঃপাল এত টাকার যোগ্য কিনা তার কোনো প্রমাণ পেয়েছেন? মহারাজা জ্যোতিঃপালকে ডেকে পাঠালেন। সব শুনে জ্যোতিঃপাল বললেন, বেশ মহারাজ, আপনি রাজ্যের ধনুর্বিদদের ডেকে পাঠান।

রাজবাড়ির সামনে বিশাল মণ্ডপ করা হলো। যথাসময়ে একে একে সব ধনুর্বিদ এসে হাজির হলো। জ্যোতিঃপাল সবার শেষে এলেন। তাঁর হাতে তির-ধনুক নেই। তিনি মহারাজকে প্রণাম করে একটি বৃত্ত এঁকে তার কেন্দ্রে দাঁড়ালেন। চারিদিকে হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে দেখছে। জ্যোতিঃপাল মহারাজকে বললেন, মহারাজ, আপনার শ্রেষ্ঠ বারোজন ধনুর্ধরকে বলুন, যারা শব্দ শুনে চুলে তির বিদ্ধ করতে পারে। বারোজন শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল।

জ্যোতিঃপাল বললেন, মহারাজ, ধনুর্ধরদের তির চালাতে বলুন, আমি ওদের নিক্ষিপ্ত তির প্রতিহত করব। ধনুর্ধররা ঘাবড়ে গেলেন। সে যে বালক মাত্র, কীকরে প্রতিহত করবে! তারা সহস্রাধিক তির নিক্ষেপ করল। জ্যোতিঃপাল চোখের নিমেষে সব তির প্রতিহত করলেন। সকলে হাততালি দিয়ে উঠল। মহারাজাও অবাক হয়ে গেলেন। জ্যোতিঃপালকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, তুমি কীকরে এত তির প্রতিহত করলে? জ্যোতিঃপাল বললেন, মহারাজ, এই বিদ্যার নাম শব্দবাহন। এ আমি গুরুদেবের কৃপায় শিক্ষালাভ করেছি। মহারাজ খুশি হয়ে বললেন, তোমার আর কোনো দিব্য বিদ্যা জানা আছে?

মহারাজের আদেশে জ্যোতিঃপাল চারজন লোককে চার কোণ দাঁড়াতে বললেন, কিন্তু কোনো লোক দাঁড়াতে সাহস পেল না। তখন চার কোণে চারটি কলাগাছ পুঁতে জ্যোতিঃপাল বললেন, আমি এক তিরে চারটি কলাগাছকে কেটে ফেলব এবং কার্য সমাধা করে তির আমার কাছে ফিরে আসবে। কথামতো এক তিরে চারটি কলাগাছ ছেদন করে তির তাঁর কাছে ফিরে এল। মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন এই বিদ্যার নাম কী? জ্যোতিঃপাল বললেন, এই বিদ্যার নাম চক্রবেধ।

জ্যোতিঃপাল আরও বারো রকমের বিদ্যার প্রদর্শন করলেন। সবাই জ্যোতিঃপালের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। মহারাজ জ্যোতিঃপালকে বললেন, আজ প্রমাণ হলো তুমি জম্বুদ্বীপের শ্রেষ্ঠ বীর। মহারাজা প্রীত হয়ে জ্যোতিঃপালকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে পুরস্কৃত করলেন।

(সংগৃহীত)

ভারতের বিপ্লবী

শৈলেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিপ্লবী শৈলেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ঢাকার বিক্রমপুরের গাণ্ডাদিয়ায়। বাবার নাম বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। এই বংশের একাধিক ব্যক্তি দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে বিপ্লবী দলের সভ্য হয়ে রাজরোষে পড়েছেন। তিনিও বাল্য বয়সেই বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে সক্রিয় কার্যকলাপে যুক্ত ছিলেন। ১৭ বছর বয়সে আইএসসি পড়ার সময় ধরা পড়েন। প্রথমে তাঁকে হিজলি জেলে রাখা হয়। সেখান থেকে বিএ পরীক্ষা দিয়ে ডিস্টিংশন-সহ পাশ করেন। পরে তাঁকে রাজস্থানের দেউলি জেলে পাঠানো হয়। সেখানেই তাঁর দেহাবসান হয়।

জানো কি?

ভারতীয় মনীষীদের উপনাম

● গান্ধীজী-- বাপু, ● সর্দার প্যাটেল–লৌহ মানব, ● বাল গঙ্গাধর তিলক–লোকমান্য, ● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর–কবিগুরু, ● চিত্তরঞ্জন দাশ– দেশবন্ধু, ● এম এস গোলওয়ালকর– শ্রীগুরুজী, ● সুভাষচন্দ্র বসু--নেতাজী, ● স্বামী বিবেকানন্দ– স্বামীজী, ● মিলখা সিংহ–উড়ন্ত শিখ, ● সচিন তেন্ডুলকর– লিট্‌ল মাস্টার, ● মদনমোহন মালব্য– মহামান্য, ● গোপালকৃষ্ণ গোখলে-- মহামতি, ● আশুতোষ মুখোপাধ্যায়–বাঙ্গলার বাঘ ● সরোজিনী নাইডু–ভারতের নাইটিঙ্গেল।

ভালো কথা

আজব প্রতিভা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ডহারবারের সরিসার চাঁদা গ্রাম। সেই গ্রামেরই মাত্র আড়াই বছর বয়সের এক পুঁচকে। নাম আরাধিতা সিংহ রায়। এই বয়সেই সে ইন্ডিয়ান বুকস অব রেকর্ডসে নাম তুলে ফেলেছে। কারণ, এই বয়সেই তার জাতীয় সংগীত মুখস্থ। জিজ্ঞাসা করা মাত্র ভারতীয় মনীষীদের নাম বলে ফেলতে পারে। তাছাড়া নাচ, গান, কবিতা বলায় একেবারে দক্ষ। আরাধিতার বাবা একটি স্কুলে অশিক্ষক কর্মচারী আর মা একটি স্কুলের শিক্ষিকা। আরাধিতার মোবাইল ফোনের নেশা নেই। কেবল ঠাকুমা, বাবা ও মা'র কাছে নানান গল্প শুনতে ভালোবাসে। আর যা শোনে সবই মনে রাখতে পারে। সবাই বলে আরাধিতার আজব প্রতিভা।

রূপম সরদার, দ্বাদশ শ্রেণী, সরিসা বাজার, দঃ ২৪ পরগনা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ভারত আমার

নিলয় রায়, একাদশ শ্রেণী, আম্বাসা, ধলাই, ত্রিপুরা।

ভারত আমার কর্ম
ভারত আমার ধর্ম
ভারত আমার প্রাণ
ভারত আমার মান।
ভারত আমার নিশ্বাস
ভারত আমার প্রশ্বাস
ভারত আমার রক্ত
আমি ভারতের ভক্ত।
ভারত আমার ইহকাল
ভারত আমার পরকাল
আমরা ভারতের
ভারত আমাদের।
ভারত আমার পিতা
ভারত আমার ত্রাতা
ভারত আমার শেষ কথা
ভারত আমার মাতা।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

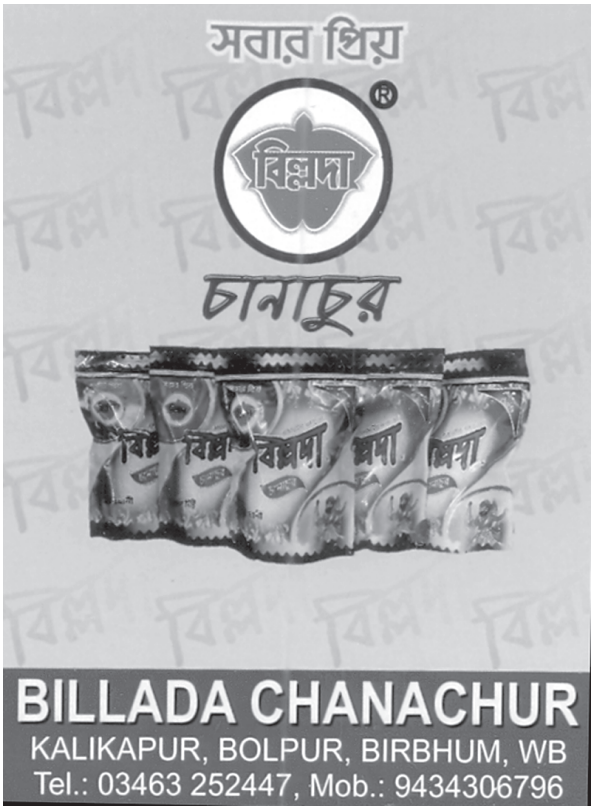

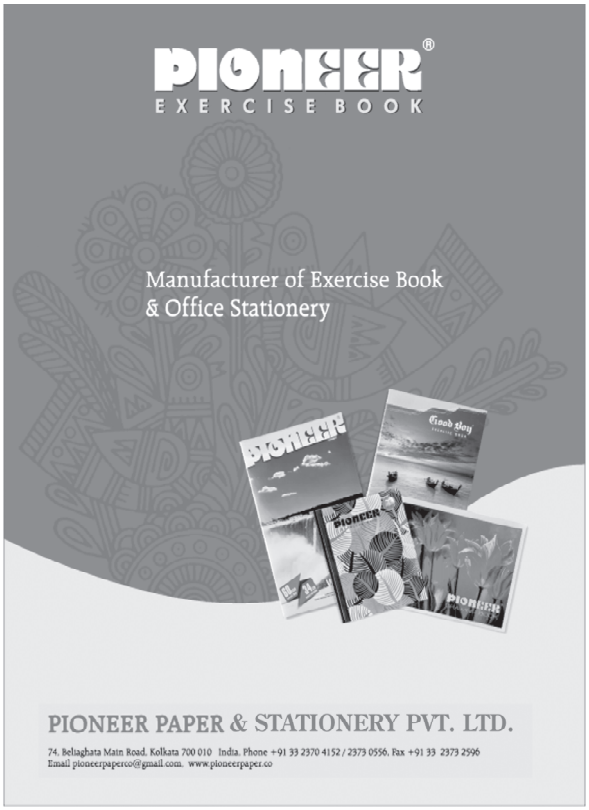

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

নারদ স্টিং অপারেশনে টাকা নিতে দেখা যাচ্ছে সৌগত রায়কে। (ফাইল চিত্র)

পশ্চিমবঙ্গে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছেন মমতা

হীরক কর

২০০১ সাল। ১৩ মার্চ। 'তহলকা ডট কম' নামে একটি ওয়েবসাইট প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের বিপুল আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ তুলে স্টিং ভিডিয়ো প্রকাশ করল। তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ, বিজেপি সভাপতি বঙ্গারু লক্ষ্মণ, সমতা পার্টির সভানেত্রী জয়া জেটলির বিরুদ্ধে বিপুল ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। দেখা গেল তা 'তহলকা'র ভিডিয়োতেও। উত্তাল হয়েছিল গোটা দেশ। ১৪ মার্চ সন্ধ্যায় শাসক জোট এনডিএ-র বৈঠক ডাকেন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বঠকট করেন সেই বৈঠক। দেশজুড়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল সেই ১৪ মার্চে, জর্জ ফার্নান্ডেজকে পদত্যাগ না করানো হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রিসভা ছেড়ে দেবেন। বাজপেয়ী সরকারের থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করবে তৃণমূল।

১৫ মার্চ জর্জ ফার্নান্ডেজ পদত্যাগ করেন। সমতা পার্টির সভানেত্রী পদ থেকে জয়া জেটলিও পদত্যাগ করেন। ১৬ মার্চ, ২০০১ মন্ত্রীত্ব থেকে ইস্তফা দিয়ে, এনডিএ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন মমতা। তার দাবি মেনে জর্জের অপসারণ সত্ত্বেও বাজপেয়ীর সরকারে থাকেননি মমতা। দুর্নীতির দাগ লেগেছে যে সরকারের গায়ে, তার সঙ্গে আর কিছুতেই নিজের নামকে বোধহয় জড়াতে চাইছিলেন না মমতা।

১৫ বছর কেটে গেছে সেই ঘটনার পর। কেন্দ্রে আবার সেই এনডিএ সরকার। আর বাঙ্গলায় মুখ্যমন্ত্রীর মসনদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার ২০১৬। আবারও সেই ১৩ মার্চ। প্রকাশিত হলো 'নারদ নিউজ ডট কম'-এর স্টিং অপারেশন ভিডিয়ো। তৃণমূলের ডজনখানেক শীর্ষ নেতাকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাত পেতে নিতে দেখা গেল ভিডিয়োতে। কোনও একটি বাণিজ্যিক সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা নিচ্ছেন মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, মেয়র, যুবনেতা, দলের ঘনিষ্ঠ আইপিএস। নারদ নিউজ প্রকাশিত ভিডিয়োতে দাবি করা হয় তেমনটাই।

২০০১-এর ১৪ মার্চ তারিখে স্টিং ভিডিয়ো খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল মমতার কাছে। কিন্তু ২০১৬-র স্টিং ভিডিয়োকে তিনি একেবারেই গুরুত্ব দিলেন না। সব দিক থেকে ইস্তফা, ইস্তফা রব ওঠা সত্ত্বেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল অবিচল।

এ যেন 'বিষবৃক্ষ'। বঙ্কিম সাহিত্যের সুবাদে এই শব্দটি আজ বাঙ্গলার সমাজপাঠে একটা কালো শব্দে পরিণত হয়েছে। 'বিষবৃক্ষ' নামক শব্দটার অবতারণা মানে এক চূড়ান্ত খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে একটি নির্দিষ্ট কিছুকে অবলম্বন করে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারি এবং তার জেরে

নারদ কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা। (ফাইল চিত্র)

ফঃ ৬

একের পর এক কোটি কোটি টাকার কালো অর্থ উদ্ধারও এখন যেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের উপরে বিষবৃক্ষের কালো ছায়াকে প্রকট করে তুলেছে। বিষবৃক্ষ একদিনে তৈরি হয় না বলেই লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্ত্রিসভা একদিনে বিষবৃক্ষে পরিণত হয়নি। একের পর এক আর্থিক কেলেঙ্কারিতে দলের মন্ত্রীরা জড়িয়েছেন, কিন্তু প্রত্যেকবারেই সেভাবে কোনও কড়া পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

কথায় আছে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলে অন্যায় একদিন সব নৈতিকতাকে গ্রাস করে। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে ইডি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার করেছে এবং প্রচুর বেআইনি সম্পত্তির হদিশ পেয়েছে বলেও দাবি করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার নিশ্চিতভাবেই ভুলটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এমনকী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের অপসারণের দাবিতে যেভাবে দলের বিশিষ্ট কয়েক জন নেতা সরব হন তা স্বাভাবিকভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরে একটা চাপ তৈরি করে। স্বাভাবিকভাবেই দলের মহাসচিব পদ এবং মন্ত্রীত্ব থেকে অপসারিত হতে হয় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে।

এবার আসা যাক বর্তমান মন্ত্রিসভাকে ঘিরে তৈরি হওয়া একের পর এক বিতর্কে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্তমান মন্ত্রিসভা শপথ নিয়েছিল ১০ মে, ২০২১। এই মন্ত্রিসভায় মমতা স্থান দিয়েছিলেন ২৬ জন অভিজ্ঞ বিধায়ককে এবং ১৬ জন নতুন মুখ ছিল। এই মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের দিন কয়েক পরেই সিবিআই গ্রেপ্তার করেছিল মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে। এর সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন মদন মিত্র। গ্রেপ্তার করা হয়েছিল শোভন চট্টোপাধ্যায়কেও। তবে তিনি তৃণমূলে ছিলেন না আর বিজেপিতে থাকলেও এবং ভোটে প্রার্থী হলেও দলীয় নেতৃত্বের উপর গোঁসা করে ফ্ল্যাটে খিল এঁটে বসেছিলেন। নারদকাণ্ডের জেরে এই গ্রেফতারি নিয়ে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল। প্রায় ৪ দিনের মাথায় জামিন পেয়েছিলেন ফিরহাদ, সুব্রত-মদনরা। এই ঘটনায় বিজেপি প্রবল হইচই করেছিল। এর সঙ্গে অবশ্যই লাগাতার বিতর্ক হয়েছে কয়লাকাণ্ড এবং গোরু পাচারকাণ্ড নিয়ে। যেখানে বারবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ইডির শমন পাঠানো নিয়ে বিতর্ক তৈরি হচ্ছিল। এর মাঝেই তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধমানের নেতা প্রণব চট্টোপাধ্যায়কেও চিটফান্ডে জড়িত থাকায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তিনি তো জেল থেকে বের হলেন এই সেদিন।

এর সঙ্গে সাঁড়াশি চাপের মতো লেগেই ছিল গোরু পাচারকাণ্ডে অনুব্রত মণ্ডলকে জেরার জন্য সিবিআইয়ের বারবার শমন পাঠানো। এই পরিস্থিতির মধ্যে দুর্নীতির প্রশ্নে এবং আর্থিক তছরুপের প্রশ্নে বারবার বিদ্ধ হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। যেভাবে দলের প্রবীণ নেতারা বারবার দুর্নীতির প্রশ্নে বিদ্ধ হচ্ছিলেন তাতে ক্ষোভ বেড়েছে দলের অন্দরেই। কয়েক মাস আগেও প্রকাশ্যে চলে এসেছিল মমতা অনুরাগী নেতা বনাম অভিষেক অনুগামীদের বাক্যবাণ এবং তর্কযুদ্ধ। প্রকাশ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই নিয়ে প্রতিক্রিয়াও দিতে হয়েছিল। দলের সমস্ত স্তরেই এক কঠোর বার্তা দিতে হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আগুনে ঘি ঢালার মতোই সমানে কাজ করে যাচ্ছিলেন কুণাল ঘোষ থেকে শুরু করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপরূপা পোদ্দার, মদন মিত্ররা। যা পক্ষান্তরে বারবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে সরাসরি নিশানা হওয়ার জায়গায় ঠেলে দিয়েছিল।

২০১১ সালে এক নতুন আশার আলো জ্বেলে বাঙ্গলায় পরিবর্তন এনেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফেলে দিয়েছিলেন ৩৪ বছরের বাম শাসনকে। এরপর থেকে প্রতি নিয়ত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ সামনে নিয়ে এগিয়েছেন। কিন্তু তার সঙ্গে বারবার বিতর্কে জড়িয়েছেন মমতার মন্ত্রী থেকে দলের সাংসদ এবং শীর্ষ নেতা থেকে দলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলা কিছু প্রভাবশালী। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর বাড়ি থেকে একের পর এক কালো টাকা এবং সম্পত্তির হদিশ মেলাটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কার্যত কোণঠাসা করে দিয়েছে।

এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের কঠোর অবস্থান বলতে গেলে ছিল ডিনামাইট ব্লাস্ট করানোর মতো। কথায় আছে কান টানলে মাথা আসে। সেই পরিস্থিতি হয়েছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে ইডির জালে ধরাই পড়ে যান পার্থ। বাঙ্গলায় ক্ষমতায় আসার পর রাজনৈতিক জীবনে এতবড়ো আঘাত হয়তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাননি। কারণ, ইডির এই নাগপাশ থেকে পার্থ উদ্ধার যে সম্ভব নয় তা বুঝতেই পারছিলেন। একটু হলেও আশা ছিল যে সময়ের সঙ্গে যদি এই ঘটনায় উত্তেজনাটা কমে আসে। সেটা তো হলোই না, উলটে ২৭ জুলাই বেলঘরিয়ায় অর্পিত মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটে নতুন করে ২৭ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা উদ্ধারের পর পার্থ বিসর্জন আপাতত নিশ্চিত হয়ে পড়েছিল।

এবার আসা যাক চৌত্রিশ বছরের বাম শাসনকে হঠিয়ে মমতার বাঙ্গলার শাসন দখল করার পরের মুহূর্তের পরিস্থিতে। একের পর এক বিতর্ক। কখনও ত্রিফলা দুর্নীতি তো কখনও নীল-সাদা রঙের প্রলেপে লুকিয়ে থাকা কালোবাজারির অভিযোগ। এমনকী অর্থ নিয়ে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকার চিট ফান্ড কেলেঙ্কারি। এখানেই শেষ নয় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে নিয়োগ থেকে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে অর্থ নয়ছয়ের অভিযোগ বারবার বিদ্ধ করেছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। এর পিছন পিছন এসেছে নারদ কাণ্ড। এর মধ্যে চিটফান্ড কাণ্ডে সাংঘাতিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে ধাক্কা দিয়েছিল।

কারণ, সারদা থেকে টাওয়ার গ্রুপ চিটফান্ড, প্রয়াগ চিটফান্ড, রোজভ্যালি চিটফান্ডকাণ্ড, আইকর চিটফান্ড কেস, সবেতেই ঘুরে ফিরে জড়িয়েছিল তৃণমূল নেতা মন্ত্রী থেকে শুরু করে সাংসদ এবং তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলা প্রভাবশালীদের নাম। এমনকী গ্রেপ্তার হতে

হয়েছিল কুণাল ঘোষকেও। সারদা চিটফান্ড কেসে এক্কেবারে শুরুর দিকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কুণাল ঘোষ সে সময় খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতিতে জড়িয়ে থাকার অভিযোগ এনেছিলেন। গ্রেপ্তার হতে হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ তাপস পাল থেকে শুরু করে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, তৎকালীন পরিবহণ মন্ত্রী মদন মিত্রকেও। চিটফান্ডের রেশ মেলাতে না মেলাতেই নারদকাণ্ডে স্টিং অপারেশন গোপন ভিডিয়োতে টাকা নিতে দেখা গিয়েছিল নেতাদের। এতে নাম জড়িয়েছিল ফিরহাদ হাকিম থেকে শুরু করে শোভন চট্টোপাধ্যায়, শঙ্কু পাণ্ডা, সুব্রত মুখোপাধ্যায়দের। এদের সকলকেই গোপন ভিডিয়োতে লক্ষ লক্ষ টাকা নিতে দেখা গিয়েছিল। এমনকী মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে সারদার হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগও ছিল। সিবিআই সেই সময় দফায় দফায় জেরাও করেছিল মুকুলকে। কিন্তু পরবর্তীকালে মুকুল রায় প্রথমে দল থেকে নিজের দূরত্ব তৈরি করেন, এরপর তিনি বিজেপিতে চলে যান। পরে আবার তৃণমূলে ফিরে নিস্ক্রিয় হয়ে যান।

দুর্নীতির দায়ে তৃণমূলের মহাসচিব ও শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কয়েক দিন আগে। পার্থর ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত মডেল-অভিনেত্রী অর্পিতার কলকাতার দুটি ফ্ল্যাট থেকে ৫০ কোটি টাকা উদ্ধার করেন ভারতে অর্থ কেলেঙ্কারি তদন্তের দায়িত্বে থাকা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডির কর্তারা। এরপর গোরু পাচারে সম্পৃক্ততার অভিযোগে রাখীপূর্ণিমার সকালে বীরভূমের বোলপুরের বাড়ি থেকে তৃণমূলের দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআই।

অনুব্রত গ্রেপ্তার হওয়ার পর রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ। রাস্তায় নামেন অনেক মানুষ। বিলি করেন গুড় বাতাসা, জল বাতাসা-সহ নানা ধরনের মিষ্টি। এ সময় অনেককে ঢাক বাজাতেও দেখা যায়। অনুব্রতকে 'গোরুচোর' আখ্যা দিয়ে গোরু নিয়ে রাস্তায়

সারদা কেলেঙ্কারিতে গ্রেফতার মদন মিত্র ও কুণাল ঘোষ। (ফাইল চিত্র)

নামেন কংগ্রেসের কর্মীরা। প্রতিবাদ মিছিল করেন। তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজ্যবাসীকে একজোট হয়ে আন্দোলনে নামার ডাক দেয় বিজেপি, কংগ্রেস ও বাম দল। বিজেপির পক্ষ থেকে পৃথক মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে অনুব্রতের পক্ষেও রাস্তায় নামেন তাঁর সমর্থকেরা।

পিছন ফিরে তাকালে দেখা যায় তৃণমূল জামানার শুরু থেকেই এ রাজ্যে সক্রিয় ছিল সিন্ডিকেট রাজ। সেই সময়ে সব্যসাচী দত্ত-র সঙ্গে বারাসতের কাকলি ঘোষদস্তিদারের মুখ দেখাদেখি বন্ধ। দু' পক্ষের অনুগামীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ লেগেই থাকত। এতটাই জল গড়িয়েছিল, যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তার মধ্যে ঢুকতে হয়। বিষয় ছিল, নিউটাউন অঞ্চলের সিন্ডিকেট কার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর থেকে রাজ্যে সিন্ডিকেট একটা স্বাভাবিক আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। সকলেরই মুখে ফেরে এই শব্দটা। সিন্ডিকেটকে মেনে নিয়েই বাঙ্গলার জনজীবন এগিয়ে চলে। এবং সিন্ডিকেটের তৎপরতা বাড়তেই থেকেছে গত দুই দশকে। বাম আমলে যা ছিল প্রোমোটার রাজ, তা তৃণমল আমলে সিন্ডিকেট রাজে পরিণত হয়। এলাকার ক্ষমতা কোন সিন্ডিকেটের হাতে থাকবে, তার উপরেই নির্ভর করে রাজনৈতিক পাশা এবং অবশ্যই আয়ের। সিন্ডিকেটের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা

রোজগার কোনও গল্প কথা নেই, তা ঘোর বাস্তব।

এই সময় রাজ্য জুড়ে শোনা যায় একদল লোকের কথা। যারা বালি মাফিয়া। তৃণমূল কংগ্রেসের গত ১০ বছর সময়কালে সবচেয়ে না হলেও স্থানবিশেষ অন্যতম সোনার খনি হয়ে উঠেছে বালিখাদান। অজয়, দামোদর, ময়ূরাক্ষী কংসাবতী , শিলাবতী, সুবর্ণরেখা নদীর বালি উত্তোলন বেআইনি। তাতে অবশ্য কিছু এসে যায় না শাসকদলের স্থানীয় নেতাদের। এই অবৈধ বালি উত্তোলনের ফলে নদীর জীবনীশক্তি হ্রাস, পাড়ের ভাঙন, নদীবাঁধের ক্ষয় এসবে এসে যায় না কাঁচা টাকার কারবারিদের। বালি দুর্নীতিতে জড়িয়ে থাকে থানাও। বীরভূম এলাকায় গোটা বালি দুর্নীতি চলে কাগজে কলমে, যার নাম প্যাড। একটি দশ টাকার নোটে গাড়ির নম্বর, খাদানের নাম ও তারিখ লেখা চিরকুট। সেটাই বালি তোলার ছাড়পত্র। এসব অভিযোগ গোপন নয়। কিন্তু কিছু যায় আসেনি এতদিন কারও। প্রকাশ্য এই দুর্নীতির এক দশক পর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লড়তে হচ্ছে এই অভিযোগের বিরুদ্ধে, যার সপক্ষে বলার মতো তাঁর প্রায় কিছু নেই।

শিক্ষা ও টেট দুর্নীতি, বলার অপেক্ষা রাখে না। সরকারি চাকরি নেতা-মন্ত্রীরা বেচে দিচ্ছেন, এমন আখ্যান সম্ভবত ভূ-ভারতে নেই। শিক্ষকতার চাকরি। এক অভূতপূর্ব কেলেংকারি। বাঙ্গলার শিক্ষা ইতিহাসে এত বড়ো দুর্নীতি আগে কখনও হয়নি। ভবিষ্যতেও সম্ভবত হবে না। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য যে পরীক্ষা তাকেই বলা হয় 'টেট'। সে পরীক্ষা নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল সরকারের আমলে। বছরের পর বছর বন্ধ থেকেছে নিয়োগ। শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে আন্দোলনরতদের উপর পুলিশি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। সারা দেশ জেনে গিয়েছে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পশ্চিমবঙ্গে টাকার খেলা চলে। যত ঘুষ, তত চাকরির সম্ভাবনা, এই হিসেবেই চলেছে বাঙ্গলা। মমতা সরকারের এই দুর্নীতি ও শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে একাধিক মামলা হয়েছে। বিজেপিতে যোগ দেওয়া তৃণমূলের বিধায়ক ফাঁস করেছেন সে দুর্নীতির খবর। স্ত্রী, আত্মীয়-সহ ৬২ জনকে চাকরি করে দেওয়ার কথা শোনা গিয়েছে তৃণমূলের নেতার কথায়। এই পরিস্থিতিতে সমস্ত বিরোধীরাই তৃণমূলকে ফের একবার নিশানা করেছে ভোটের সময়ে। শুধু প্রাথমিক শিক্ষক নয়, গোটা শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থাই ধ্বসে পড়েছে বাঙ্গলায়। স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা নিয়ে যে অব্যবস্থা রাজ্যে তৈরি হয়েছে, তাতে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় চেহারাও অতীব সংকটজনক। এই পরিস্থিতি একই সঙ্গে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ নষ্ট করছে, যোগ্যতমকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, তেমনই যোগ্যতমের কাছ থেকে শিক্ষা পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে সমস্ত স্তরের শিক্ষার্থীদের।

রাজ্যে জামাত-ই-ইসলামির বাড়বাড়ন্ত। সে অভিযোগ খুব যে প্রমাণ করা গিয়েছে এমন নয়, কিন্তু মমতা সরকারের বেশ কিছু পদক্ষেপের সঙ্গে এই অভিযোগ এমনভাবে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে অনেকের কাছেই। এমন অভিযোগও উঠেছে যে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে জামাতের দুষ্কৃতীরা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে। এবং তাতে মদত রয়েছে সরকারি দলের লোকজনের। খাগড়াগড় বিস্ফোরণকাণ্ডে বেশ কিছু জঙ্গি যোগাযোগ এনআইএ-র তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হবার পর ধারে ও ভারে এই অভিযোগ বেড়েছে। এবারের ভোটে বিজেপির নেতারা, বিশেষ করে দলত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়ে বিরোধী দলের নেতা হওয়া শুভেন্দু অধিকারী এই প্রসঙ্গে অতি সরব। তবে এ অভিযোগ যতই নিবিড় হোক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বা দলের বিরুদ্ধে তা এখনও অপ্রমাণিতই। তবে তৃণমূলের এক রাজ্যসভা সদস্যের সঙ্গে বাংলাদেশের জামাতে ইসলামির যোগাযোগ রয়েছে বলে অভিযোগ। তাঁর ব্যবস্থাপনায় সীমান্ত পেরিয়ে জামাতের হাতে কোটি কোটি টাকা পৌঁছেছে বলেও খবর। অভিযোগ, খাগড়াগড়ে জামাতের স্লিপার সেল চলত এবং তেমন স্লিপার সেন তৃণমূল আমলে বহুল পরিমাণে চালু রয়েছে।

জামাত যোগের প্রসঙ্গ যে যে কারণে গুরুত্ব পেয়েছে, তার অন্যতম, মমতার মুসলমান ভোটব্যাংক নির্ভরতা ও তা নিয়ে কোনও রকম লুকোছাপা না করা। 'যে গোরু দুধ দেয়, তার লাথিও সইতে হয়'— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বয়ান এত বহুল স্তরে প্রচারিত হয়েছে যে তা পৌঁছয়নি এমন কোনও কান পশ্চিমবঙ্গে সম্ভবত নেই। এর পর ইমামভাতার ঘোষণা ও তা লাগু করার ফলে মমতা সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমান তোষণের অভিযোগ আরও সুদৃঢ় হয়। ইমামভাতা চালু হয় মমতা ক্ষমতায় আসার এক বছরের মধ্যেই। ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে। ইমামদের জন্য মাসে আড়াই হাজার টাকা ও মুয়াজ্জিনদের মাসে দেড় হাজার টাকা করে দেবার কথা ঘোষণা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পর মুসলমান তোষণের অভিযোগ চরমে ওঠে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে।

আমফান ঝড়ের সময়ে মমতা সরকার দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানোর ব্যাপারে যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু গোলমাল শুরু হয় তার পরে, যখন দুর্গতদের জন্য সাহায্যের দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করে সরকার। ত্রাণ বিলিতে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। তা নিয়ে এবার এই নির্দেশ পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার। এর ফলে দুর্নীতির অভিযোগ আরও পাকাপোক্ত হয়। বিজেপি কোনও জায়গাতেই আমফান দুর্নীতির উল্লেখ করতে ছাড়ছে না। এমনকী এর তদন্তে বিশেষ তদন্ত দল গঠনের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে তারা।

'চপশিল্প'-এর কথা বলে মমতা বাঙ্গলায় বহুনিন্দিত হয়েছেন। রাজ্যে বিনিয়োগ আনার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ না হতে দিয়ে তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন, আর শিল্প ক্ষেত্রে রাজ্যের পিছিয়ে পড়ার জন্য তিনি নিজে ভোটের হারে কতটা পিছিয়ে পড়বেন, সে নিয়ে তৃণমূলের অভ্যন্তরে আশঙ্কার শেষ নেই। মমতা শিল্প আনার জন্য মাঝে মাঝে বিদেশ গিয়েছেন, সেখানে গিয়ে তাঁর তাঁবেদার সাংবাদিক রুপোর চামচ চুরি কেলেঙ্কারিতে জড়িয়েছেন। কিন্তু শিল্পে বিনিয়োগ অআসেনি। শিল্পোদ্যোগীদের

সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন। (ফাইল চিত্র)

ডেকে বছর বছর মেলা করছেন। তাতে দেশের তো বটেই এমনকী বিদেশের কোনও কোনও উদ্যোগপতিও হয়তো যোগ দিয়েছেন। প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। কিন্তু বাঙ্গলায় কোনও শিল্প গড়ে ওঠার হদিশ পাওয়া যায়নি। যা থেকে কর্মসংস্থান হতে পারে। এই ইস্যুতেও বিজেপি চেপে ধরেছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। তারা গুজরাট-সহ বিজেপি শাসিত রাজ্যের শিল্পের খতিয়ান দেখাচ্ছে এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে শিল্পোন্নত বাঙ্গলার।

মমতার ভোট যুদ্ধ জয়ের অন্যতম শস্ত্র ক্লাব। তাঁকে 'সিপিএমের ভালো ছাত্রী' বলে উল্লেখ করা হয় যে যে কারণে, তার অন্যতম কারণ ক্লাবকে নিজের দখলে নিয়ে আসা। বাম আমলের মাঝামাঝি সময় থেকে শাসক দল ক্লাবগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিজেদের আওতায় আনতে শুরু করে। তাই সাফল্য ছিল তাদের সংগঠনে। সাংগঠনিক ভিত অতীব মজবুত হবার কারণে সিপিএম এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সাফল্য পায়। তৃণমূল কংগ্রেসের তেমন কোনও সাংগঠনিক ভিত্তি নেই। ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তিনি দুর্গাপুজো-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে ক্লাবগুলোকে আর্থিক অনুদান দিয়েছেন এবং এর ফলে তাঁবে রেখেছেন ক্লাবের সংগঠনকে। শামিল করেছেন প্রচারে। ভোট একজোট করেছেন অনেকটাই। প্রথম দিকে বিষয়টা এতটাই চোখে লাগার মতো ছিল যে সকলেই হতচকিত হয়েছেন, কিন্তু মমতার শাসনকালে এসব শুধু অভ্যাসই নয়। নিয়ম হিসেবেও মেনে নিতে শুরু করেছেন সবাই। এক দশক নিরবচ্ছিন্নভাবে শাসনকাল চালাবার পর আজ এসব নিয়েই প্রশ্ন উঠতে

ট্রাকে করে পাচার হচ্ছে গোরু।

বিভিন্ন খাদান থেকে এভাবেই অবৈধভাবে তোলা হচ্ছে বালি।

শুরু করেছে, ক্রমশ কোণঠাসা হচ্ছেন তিনি।

কয়লা কেলেঙ্কারি সম্ভবত তৃণমূলকে সবচেয়ে বেশি কোণঠাসা করেছে সম্প্রতি। এই দুর্নীতির তদন্তে সিবিআই ও ইডি একযোগে তদন্ত করছে, জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী, শ্যালিকা ও আরও আত্মীয়কে। তৃণমূল নেতা বিনয় মিশ্র ফেরার হয়েছেন এই কাণ্ডে। রানিগঞ্জ আসানসোল এলাকায় বিভিন্ন জায়গা থেকে কয়লা তুলে তা পাচার করা হতো ঝাড়খণ্ড, বিহারে। এই সিন্ডিকেট প্রতিদিন বাজার থেকে প্রায় ২০ কোটি টাকা আয় করত বলে অভিযোগ। এই কেলেঙ্কারির তদন্তে নেমেছে সিআইডি ও ইডি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, এ ভাবে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে ভয় দেখাতে চাইছে কেন্দ্রে সরকারে থাকা বিজেপি। এমনকী প্রশ্ন তোলা হয়েছে, রাজ্যে তদন্তের জন্য সিবিআই কেন রাজ্য সরকারের অনুমতি নিল না। কেন্দ্রীয় সংস্থা অবশ্য তার যথোচিত উত্তরও দিয়েছিল। তার পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। কয়লা নিয়ে মমতা-অভিষেক যে কোণঠাসা হয়েছেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই ইডি-সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছেন গোটা দলকে।

কয়লা পাচারের লালা ও গোরু পাচারের এনামুলের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগও সামনে এসেছে। কয়লার গাড়িতে গোরু ও গোরুর গাড়িতে কয়লা পাচার করা হতো বলেও জানা গেছে। গোরু পাচার কাণ্ডেরও তদন্ত করছে সিবিআই। এনামুল হক এই পাচার চক্রের হোতা। গোরু পাচারে অভিযুক্ত বিএসএফ কর্মী সতীশ কুমারের সম্পত্তির পরিমাণ দেখে বিস্মিত হয়েছে সিবিআইও। সিবিআইয়ের দাবি, এনামুলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের। মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ী এনামুলকে গত নভেম্বর মাসে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। ভিন দেশে গোরু পাচার করে কোটিপতি হওয়ার জন্য আর কোন কোন নেতার যোগ ছিল, তাই এখন খতিয়ে দেখছে সিবিআই। প্রশ্ন উঠেছে, রাজ্য প্রশাসনের নজর এড়িয়ে এত বড়ো চোরাকারবার চালানো সম্ভব কি না। এটাই 'বিষবৃক্ষ'। বঙ্কিম সাহিত্যের সুবাদে এই শব্দটি আজ বাঙ্গলার সমাজ পাঠে একটা 'কালো শব্দ'-এ পরিণত হয়েছে।

এই মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেসের নবীন সদস্যদের মধ্যেও প্রশ্ন যে দলের অভিজ্ঞ নেতাদের যদি এই হাল হয় তাহলে ভেবে দেখার সময় এসেছে। রাজনীতি করতে গেলে অনেক কালিমা শরীরে লাগে। এরমধ্যে অনেকটা অংশ অবশ্যই সাধারণ মানুষের ওপরে ছেড়ে দিতে হয়, তারাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করেন আদৌ কোনও রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আদৌও ঠিক না বেঠিক। কিন্তু এর বাইরে একটা অংশ থাকে যেখানে দলকে সবসময় নিজেকে কার্যত গঙ্গার মতো পবিত্র থাকার অঙ্গীকার করে দেখাতে হয়। কিন্তু বর্তমানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সরকার যেভাবে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগে ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছে তাতে অবিলম্বে সমস্ত মন্ত্রীকে সরিয়ে নতুন করে মন্ত্রিসভা গঠনের প্রয়োজন আছে বলেও তৃণমূল কংগ্রেসের একটা অংশ মনে করছে।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে মন্ত্রীত্ব থেকে অপসারণের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন আপাতত ৩টি দপ্তর তাঁর কাছে এলেও মন্ত্রিসভার গঠন করেই এই দপ্তর বিলি করতে হবে। নতুন করে মন্ত্রিসভার গঠন মানে কী বোঝাতে চেয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়?

তাহলে কি বর্তমান মন্ত্রিসভা ভাঙছে, আর সেই জায়গায় আসছে নতুন মন্ত্রিসভা। তবে কি জানুয়ারিতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে অবসর নেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের নতুন কাণ্ডারী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? প্রশ্ন চিহ্নটা থেকেই যাচ্ছে।

এটা এখন যতই জল্পনার পর্যায়ে থাকুক যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে তা হবে এক নজির বিহীন ঘটনা। তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরের একটা বিশাল অংশ মনে করছে যেভাবে দুর্নীতির অভিযোগ বিজেপি বা অন্য বিরোধীরা তৃণমূলকে আক্রমণ করছে তাতে নতুন মন্ত্রিসভার গঠন এই বিতর্কে জল ঢেলে দেবে। দেখা যাক পদত্যাগের দাবিকে কতদিন উপেক্ষা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। □

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৯

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

দেবী প্রসঙ্গ

স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ

উপন্যাস

প্রবাল - বায়ু বহে পূর্ব সমুদ্র হতে ● **এষা দে** - একটি কাল্পনিক কাহিনি
সুমিত্রা ঘোষ- স্বপ্ন ধরার জন্য

জীবনের কথা

বিজয় আঢ্য

পুরাণ

ড. জয়ন্ত কুশারী

বড়ো গল্প

সন্দীপ চক্রবর্তী - বাঁধন

গল্প

শেখর সেনগুপ্ত, দীপ্তাস্য যশ, নিখিল চিত্রকর, সিদ্ধার্থ সিংহ

প্রবন্ধ

রঙ্গাহরি, নন্দলাল ভট্টাচার্য, প্রবীর আচার্য, সুজিত রায়,
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুজিত ঘোষ

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ১৩।।

এরপর থেকে সন্ন্যাসী আর ভক্তদের কাছে তাঁর যাতায়াত ক্রমে বাড়তে লাগল। কুঞ্জদাসজী তাঁকে ডাকতেন 'পণ্ডিত' বলে। বাবা-মার কথা চিন্তা করে তাঁদের সেবার জন্যই তিনি বাড়ি ফিরে আসতেন।

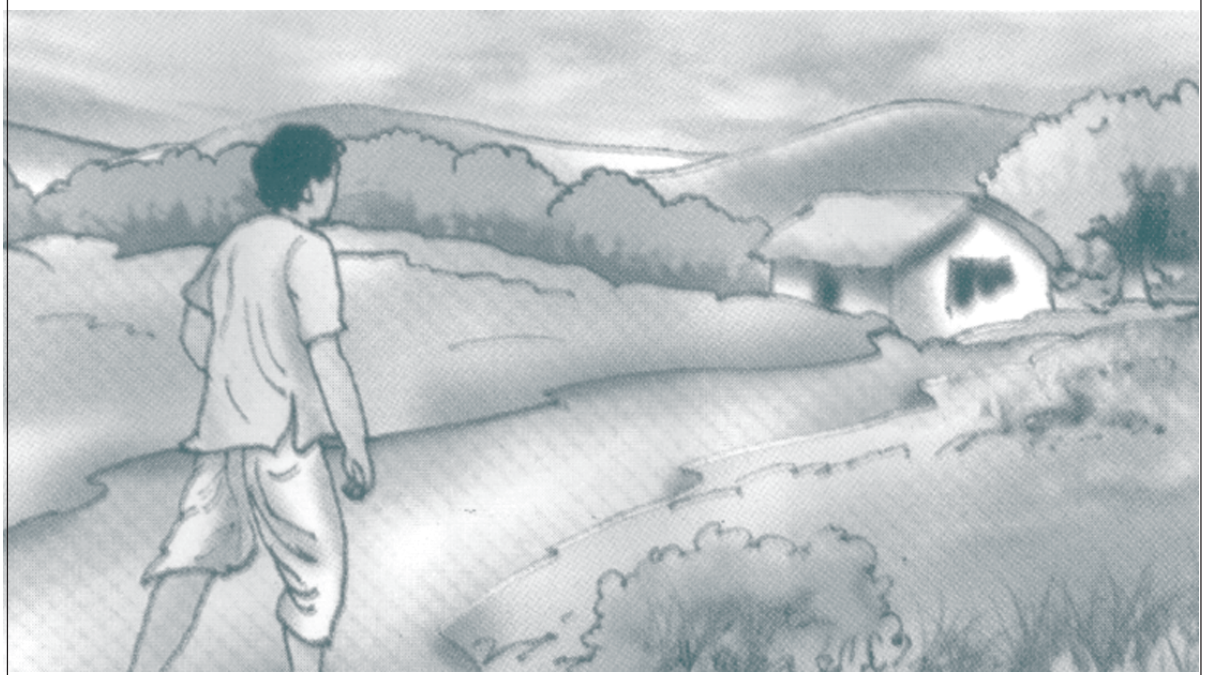

প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর ভবলীলা সম্বরণ করলেন। বঙ্কিম পথে মাদারীপুরে সে খবর পেলেন। বাড়ি ফিরলেন শুধু বাবার কথা মনে করেই।

(ক্রমশ)